পঞ্চম অধ্যায়

নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থান : বাংলা ছোটগল্প

লেখক তাঁর মনন, চেতনা এবং সাহিত্যিক বোধ দিয়ে একটি বিশেষ সময়ের অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন অনুভূতির সংমিশ্রণে ভাষায় ব্যক্ত করেন সাহিত্যের আধারে।অভিজ্ঞতার আলোকে, সামাজিক অবস্থাকে সৃজনশীলতার দক্ষতায় সাহিত্যের এক অলৌকিক অনুভবকে নির্মান করেন সাহিত্যিক। সাহিত্যিকেরা এইভাবেই সমকালীন সমাজজীবনের বাস্তব অবস্থাকে ব্যক্ত করেন নিজস্ব চেতনার আলোকে। আর আলোচনা যখন হচ্ছে নকশাল আন্দোলনকে নিয়ে তখন রাজনীতি আর জীবন পৃথক থাকে না সব মিলেমিশে এক হয়ে যায়। ১৯৬৭ সালে শুরু হওয়া নকশালবাড়ি আন্দোলনের মূল চাহিদাই ছিল 'তরাইয়ের সব জমি কৃষকের'। জোতদার, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে কৃষক সমাজ ও সর্বহারা শ্রেণির হাতে ক্ষমতাকে অর্পণ করতে হবে, এটাই উদ্দেশ্য ছিল নকশালবাড়ি আন্দোলনের। যা শেষপর্যন্ত ঘটেনি। বিপ্লবকে দীর্ঘজীবী করে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল সাংগঠনিক দক্ষতার এবং সুযোগ্য নেতৃত্বের, কিন্তু দুটির কোনোটিই সার্থকভাবে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। নকশাল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যারা স্বপ্ন দেখেছিলেন গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরতে হবে, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তাদের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। নকশাল ভাবনার আধারে গড়ে ওঠা ছোটগল্পে এই সংগ্রাম, বেদনা, যন্ত্রণার ইতিবৃত্তকেই প্রকাশ করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। প্রশাসনিক সন্ত্রাসের আবহে যে হত্যার রাজনীতিকে প্রতিরোধরূপে তুলে ধরা হয়েছিল সেই আন্দোলনের দুর্বলতাকেও অনেক গল্পকাররাই তাঁদের গল্পের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন । তবুও সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র ক্ষমতার দম্ভের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে দুর্বার স্বপ্ন, সুযোগসন্ধানী, সুবিধাভোগী ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে মুক্ত হয়ে সংগ্রামের জন্য আপ্রাণ যে সৎ প্রচেষ্টা তারই স্বরূপে উদ্ভাসিত এই গল্পগুলি। এই অধ্যায়ে এইরকমই নির্বাচিত কতগুলি

গল্পের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আজকের প্রেক্ষিতেও স্বাধীনতা – উত্তর পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের সবথেকে দ্বন্দ্বমুখর সময়ের স্বরূপকেই প্রকাশ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

১. খোদহাটির ডাক : ব্রজেন মজুমদার

নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নেতৃত্ব দখলের লড়াই যে আদর্শকে তুচ্ছ করে দিতে পারে তারই ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়েছে ব্রজেন মজুমদারের ‘খোদহাটির ডাক’ গল্পটিতে । রাজনৈতিক স্বার্থপূরণের জন্য প্রয়োজন মাফিক দলবদল করে সুবিধা আদায়ের চেষ্টাই যে বহু নেতার একমাত্র ধর্ম সেই চির পুরাতন অথচ চিরনবীন সত্যটিকেই এই গল্পে তুলে ধরা হয়েছে । খোদহাটির মাঠের জমি দখলের গল্প এটি । জোতদারের বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে জমি রক্ষা করা গেছে । কিন্তু শংকা প্রচুর কারণ জমিদাররা অঞ্চল প্রধান, শক্তি সরকারের পাঁচজন গুন্ডা সর্দার আর একজন এম. এল. এ মিলে মিটিং করে ঠিক করেছে পাঁচশো ঠেঙারে নামিয়ে খোদহাটির মাঠে হাল ফেলতে দেবেনা । অবশ্য হাজার হাজার কৃষক ও তৈরি এদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য । কিন্তু স্বার্থের সংঘাতে কৃষক নেতা রাধিকা আন্দোলনটির অভিমুখ ঘুরিয়ে দিতে চায় । সে বলে – ‘ মার খেয়েই যদি ফৌত হয়ে গেলুম, তবে আন্দোলনটা করবে কে? সের জন্যি বলা হচ্ছে, আন্দোলন এমন কায়দায় চালাতে হবে , যাতে সাপ ও মরে, লাঠিও না ভাঙে’।[১]

মধু মাহাতোর ছেলে সোনা এই লড়াইয়ে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেখিয়েছে – সে রাধিকার কথা বুঝতে পারে না । সন্দেহ হয় । নিঃসংশয় হতে পারে না । তার মত হল – ‘আন্দোলন যেভাবে শুরু হয়েছে , সে ভাবেই হবে, এর অন্যথা হবেনি।’ অন্যান্য কৃষকেরাও রাধিকার সঙ্গে সহমত হয় না । তারা নেতা মধু মাহাতোর নির্দেশ শুনতে চায় । কিন্তু মধুকে খুঁজে পাওয়া যায় না । মধুর সন্ধানে বের হয় সোনা । এই লড়াই দীর্ঘ দিনের । চাষের জমিকে ভেড়িতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হচ্ছে । দেওয়ানি মামলার রায় সোনার পক্ষে থাকা

সত্ত্বেও চাষ করতে গিয়ে দাঙ্গা হচ্ছে । ‘শত শত বিঘে আবাদি জমি জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে যুগের পর যুগ । সোনার বুকটা টনটন করে ওঠে এ সব কথা ভাবলে । এই কালো কালো ভুতুরে বাঁধগুলো যেন বহু দানবের কঠিন বাহুর মতো পৃথিবীর কণ্ঠরোধ করছে । বিরোধ বেধেছে তাই । ওই কালচে রঙের আবাদি মাটি , যার মধ্যে তার পূর্বপুরুষের চোখের জল আর হাজার হাজার চাষি বউয়ের লক্ষ্মীর পট চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে , সে মাটি মুক্ত করতে হবে ‘।[৩]

বিভিন্ন কৃষক সমিতির অফিস ঘুরে সোনা বাবার খোঁজ করতে গিয়ে খবর পায় না। কিন্তু সে বুঝতে পারে আপসের রাজনীতিতে নেতারা আন্দোলন থেকে হাত গুটিয়ে নিতে চায়। কৃষক নেতা কাশীবাবু সোনাকে নির্দেশ দেন – ‘শোনো,জমিতে লাঙল দেবে । কিন্তু দাঙ্গা করতে পারবে নি । চিরকাল যেভাবে চাষ করতে , সেইভাবে চাষ করবে । কোনো জমিদারের বেটা জমিদারের সাধ্য নেই, চাষিদের উচ্ছেদ করে’ ।[৪]

সোনা স্পষ্ট বুঝতে পারে কাশীবাবুদের অভিপ্রায় । কৃষকদের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে জোতদারদের সহায়তা করা । সোনাকে এটাও বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে মধু মাহাতো এই আপস মেনে নিয়েছে । সোনা এটা বিশ্বাস করতে চায় না । সে বাবার খোঁজ করতে থাকে কাটিপোতা – গড়পার – দক্ষিণ তেউরিয়া – আটমরা – কামডহরি – চকশ্রীহরি কোথাও মধু মাহাতোকে পাওয়া যায় না । শেষ পর্যন্ত খুঁড়িগাজির হাটখোলায় একজন জমিদার বাড়ির পেয়াদার কাছ থেকে খবর পেয়ে কাছারি বাড়ির গুমঘর থেকে মৃতপ্রায় মধু মাহাতোকে উদ্ধার করে । কিন্তু শেষরক্ষা হয় না । জমিদারের রক্ষীবাহিনীর ছোঁড়া বল্লমের আঘাত থেকে সোনাকে রক্ষা করে নিঃসাড় মধু মাহাতোর দেহ। লাঠি চালিয়ে রক্ষীবাহিনীকে পরাস্ত করে প্রাণহীন মধু মাহাতোর দেহ নিয়ে সে ছুটে চলল খোদহাটির দিকে । খোদহাটির মাঠে শুইয়ে দিল পিতার দেহকে । এবার যে লড়াই হবে তাকে স্তব্ধ করা যাবে না । সে লড়াই – এর জন্য হাঁক দেয় – ‘সে হাঁক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল তল্লাট জুড়ে – আকাশ কাঁপিয়ে – নক্ষত্র

জাগিয়ে ! আর সঙ্গে সঙ্গে মাহাতোর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত হাজার হাজার মশাল হয়ে জ্বলে উঠল! খোদহাটি থেকে বিদ্যাধরী পর্যন্ত !’[৫]

ভূমি সংস্কার আইনের দ্বারা মেছোভেড়ির কোনো উর্ধ্বসীমা নির্ধারিত না হওয়ার জন্য কৃষিজমিতে নোনাজল ঢুকিয়ে মেছোভেড়িতে রূপান্তরিত করার প্রবণতা জোতদারদের মধ্যে দেখা যেত। ১৯৭৪ সালে চব্বিশ পরগণা জেলার সেটেলমেন্ট অফিসার সুন্দরবন এলাকার একটি মেছোভেড়ি নিয়ে সমীক্ষায় বলেন যে , ‘ওই মেছো ভেড়িটি ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত একটি গ্রাম ছিল । ১৯৫৬ – তে নোনাজল ঢুকিয়ে প্রায় সমগ্র গ্রামটিকে মেছোভেড়িতে রূপান্তরিত করা হয়’।[৬] এই বাস্তব ঘটনার ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায় আলোচ্য গল্পে । পাশাপাশি রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য যে স্বার্থের অন্ধ রাজনৈতিক নেতৃত্বের মদতে চলতে থাকে তার মুখোশ ও খুলে গেছে এই গল্পটিতে ।

২. সংকটের কাল : সুধীর করণ

সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসকে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল একদিন, তাদের মধ্যে মহিলাদের ভূমিকাও ছিল অসীম। সুধীর করণের ‘সংকটের কাল’ গল্পটি তারই দৃষ্টান্ত। শালবনি অঞ্চলের পঁচিশ বছরের যুবক মধু এবং তার প্রেমিকা মানালি নকশাল হয়ে যায় । জাতিতে মল্লক্ষত্রিয় মধুর বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে একদিন সারারাত ধরে কলকাতার ছেলেরা ওকে বুঝিয়েছে , ওরা কী করতে চায় । তারপর থেকে মধু কয়েকবার ওদের খড়গপুর আর মেদিনীপুরের মিটিং – এ গেছে। মধু ওদের কথা শুনে বিশ্বাস করেছে ধনী চাষি আর সুদ খোর মহাজনদের সরিয়ে দিতে না পারলে দেশসুদ্ধ সবাইকে মরতে হবে । খুন হত্যা পুলিসি সন্ত্রাসের যে অনুষঙ্গ আমাদের নকশাল আন্দোলনের ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত তার সমস্ত ঘটনাচক্রই এই গল্পে গল্পকার ঘটিয়েছেন। তাই ধনী লোকের গলা যেমন কাটা পড়েছে-ধনী চাষির বাড়িতে

ডাকাতিও হয়েছে । যাদের বাড়িতে বন্দুক ছিল তাদের বন্দুক ও হাতিয়ারও লুঠ হয়েছে। তবে বিশেষত্ব হল – 'ডাকাত দলের নেত্রী একটি কুড়ি – বাইশ বছরের মেয়ে – আর ডাকাতরা সবাই আঠার কুড়ি বছরের কিশোর'।[৭] মধুর বাবার উপর পুলিসি অত্যাচার হয়েছে । প্রচুর পরিমাণে ধেনো মদ খাইয়ে লাঠির বাড়ি খেয়ে রক্ত বমি করে মারা গেছে । এরই ফলশ্রুতিতে পুলিসের চর হারাধন মধু ও মানালির দ্বারা নিহত হয়েছে । তবুও পুলিস এদের ধরতে পারেনি । দারোগা সাহেবের দ্বারা পাওয়া খবর অনুযায়ী মধুর গ্রাম ও পাশ্ববর্তী জঙ্গল ঘিরে রাখা হয় । কিন্তু দেখা পাওয়া যায় শুধু গ্রামের মেয়েদের । অস্ত্র হাতে বল্লম ,টাঙি, কুড়ুল, লাঠি,বঁটি হাতে । কোন ছেলের অস্তিত্ব নেই গ্রামে । তল্লাশি করে কাউকে পাওয়া যায়নি । দারোগা সাহেব বুঝেছেন এ তার বড় সংকটের কাল । কারণ 'এমন করে কি নকশালকে শেষ করা যায় ? ওরা তো রক্তবীজের ঝাড়'।[৮]

৩. দ্রৌপদী : মহাশ্বেতা দেবী

একটি অস্থির বাতাবরণের মধ্য দিয়ে চলেছিল নকশাল আন্দোলনের সমকালীন বাংলা সাহিত্য । অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে হতাশা । প্রত্যাশার ভাঁড়ার শূন্য। আদর্শহীনতার পাশাপাশি ছিল একধরণের করুণ অসহায়তা – আর এই সমস্ত প্রতিবেশ অনেক বুদ্ধিজীবীকেই সুবিধা অনুযায়ী নিশ্চুপ করিয়ে রেখেছিল । এই আঙ্কিক নীরবতার বাইরে যাঁরা এই সময়কে সাহিত্যে সোচ্চার করে তুলেছেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন মহাশ্বেতা দেবী। 'সত্তরের আন্দোলন নিয়ে যদি লিখে থাকি, তা লেখা আমার পক্ষে ছিল (যা লেখা আজও আমার কাছে আছে) লেখক হিসাবে প্রাথমিক কর্তব্য'।[৯]

নকশাল আন্দোলনকে নিয়ে লেখা মহাশ্বেতা দেবীর-র 'দ্রৌপদী' গল্পটি আমাদের তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থার নির্লজ্জ-নির্মম শোচনীয় অত্যাচারের চিত্রকেই

স্পষ্ট করে তোলে। সাঁওতালি মেয়ের নাম দ্রৌপদী কেন? গল্পের শুরুতেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে । আর গল্পের শেষে নগ্ন দ্রৌপদী – র দর্পিত অবস্থানই আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে মহাভারতের কাল থেকেই প্রকাশ্যে মেয়েদের নগ্ন করার মধ্য দিয়ে পৌরুষের যে মিথ্যা অহমিকা তৃপ্ত হয় তা আজও অব্যাহত ।

'দ্রৌপদী' বা গল্পে 'দোপ্‌দি' এবং তার স্বামী দুলন্‌ মাঝি ঊনিশশো একাত্তর সালের বিখ্যাত অপারেশন বাকুলিতে সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন করেছে এবং 'আপার কাস্টের ইঁদারা ও টিউবওয়েল' দখল করেছে । এছাড়া পুলিস ধরতে এলে মৃত মানুষের মত ভান করে পড়ে থেকেছে । পরে সুযোগ বুঝে গা ঢাকা দিয়েছে । দীর্ঘদিনের বঞ্চনা আর শোষণ যখন জমাট বাঁধতে থাকে তখনই প্রতিবাদ গর্জে ওঠে । এই গল্পেও জোতদার সূর্য সাউ বি . ডি. ও – সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে দুবছরে বাড়ির মধ্যে দুটো টিউবওয়েল বসিয়েছে । তিনটি কুঁয়ো খুঁড়েছে । কিন্তু খরাগ্রস্ত বীরভূমের কোথাও জল নেই । সূর্য সাউ ডোম চাঁড়ালকে জল দেয় না । 'খরায় মানুষের ধৈর্য সহ্য সহজে জ্বলে'।[১০] সূর্য সাউ খতম হয়ে যায় । আর এই অপরাধেই 'মোস্ট ওয়ান্টেড' হয়ে ওঠে দ্রৌপদী আর দুলন। খবর পাওয়া যায় ঝাড়খানী জঙ্গলে লুকিয়ে আছে তারা । ফলে ঝাড়খানী জঙ্গল প্রায় সেনা দিয়ে মুড়ে ফেলা হয় । তাদের হাতেই ধরা পড়ে যায় দুলন এবং তাকে নিহত করা হয় । এরপর খোঁজ শুরু হয় 'দোপদি' – র । শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে 'দোপদি' । সারারাত সে সান্ত্রীদের দ্বারা ধর্ষিত হয়। সকালে 'দ্রৌপদী' সেনানায়কের সামনে উপস্থিত করা হলে নিজের গায়ের কাপড় সে নিজেই ছিঁড়ে ফেলে । নগ্ন 'দ্রৌপদী' এইভাবেই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে উলঙ্গ করে দিয়ে বলে ওঠে – 'কাপড় কী হবে , কাপড় ? লেংটা করতে পারিস , কাপড় পরাবি কেমন করে ? মরদ তু ?

'চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুথু ফেলতে সেনানায়কের বুশশার্টটা বেছে নেয় এবং সেখানে থুথু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কী করঠব? লে: কাঁউটার কর্‌ , লে: কাঁউটার কর্‌ - ?

'দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়'।[১১]

৪. গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার : মণি মুখোপাধ্যায়

রাষ্ট্রশক্তির সন্ত্রাস ও অত্যাচার সইতে সইতে কিভাবে অসহায় সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে তার গল্প মণি মুখোপাধ্যায়ের 'গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার'। হত দরিদ্র গোপাল গত বর্ষায় এই তল্লাটের গরিব মানুষগুলির সঙ্গে 'মিলেঝুলে , মিটিং মিছিল করে বড়ো জোতদার প্রসন্ন হালদার মশায়ের রেললাইন বরাবর কিছু বেনাম জমি দখল করেছিল । সবাই মিলে সে সব ভাগজোক করে চাষাবাদ চালাচ্ছিল । মাস চারেকের খোরাকি আসছিল ঘরে । বাদবাকি মাসগুলি জন মজুর খেটে, একবেলা খেয়ে, বউ পরের বাড়ি ভানাকোটা করে কোনও রকম চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল'।[১২]

তবে এ বছরই দখলি জমি আর দখলে রাখা সম্ভব হল না । জোতদার প্রসন্ন হালদার তার দখলি জমি উদ্ধারের কাজে সচেষ্ট হলেন । গোপাল কাহার এই সত্যটি উপলব্ধি করল তার উচ্ছেদ আসন্ন । গত বছরের চার মাস অন্তত সে খোরাকির জন্য নিশ্চিন্ত ছিল । আজ এই বছর সেই নিশ্চিন্ত চারমাস অনিশ্চিন্ত আটমাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল । ক্ষুধার্ত, পরিশ্রান্ত, অনিশ্চিত ভবিষ্যতে আক্রান্ত গোপাল কাহারের ভগ্নপ্রায় বাড়িতে এরপর উপস্থিত হয় পুলিস। সামান্য ভুল বোঝাবুঝিতে পুলিস ধারণা করে গোপাল আই . বি- র লোককে খুন করেছে। কোনো তথ্য প্রমাণ যাচাই না করেই গোপালকে পুলিস গ্রেপ্তার করে এবং গোপাল যে গণতন্ত্রের পক্ষে ভীষণ মারাত্মক তা ঘোষণা করে । যদিও গোপাল বার বার বলে– 'ওই যে – কী নাম বইললেন, গণতন্ত্র না কী । বিশ্বাস করেন বাবু, ওনাকে আমি চিনিও না। কুন দিন দেখি নাই। কোথায় থাকেন, তাও জানিনে!'[১৩] গোপালের এই সত্য উক্তি পুলিসের কাছে মনে

হয়েছে নিখুঁত অভিনয় । অত:পর চলতে থাকে অকথ্য পুলিসি নির্যাতন । কারণ পুলিসের হাত ধরেই গণতন্ত্র বাঁচবে। এই যে মিথ্যা প্রহসন – রাষ্ট্রের সন্ত্রাসের চক্রান্ত, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার আর তার জন্য গোপাল কাহারদের বাঁহাতখানি বিসর্জন দিতে হয়, সেই অন্যায়ের প্রতিরোধ গড়ে উঠবেই । তাই গোপাল কাহারদের শপথ নিতেই হয় – 'সে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে , যে গণতন্ত্রের জন্য সে বাঁহাতখানি সেলামি দিয়াছে , সেই গণতন্ত্রকে ভাঙিয়া সকলের ব্যবহারযোগ্য একটা নতুন গণতন্ত্রের জন্য সে তাহার দক্ষিণ হাতখানিও সেলামি দিবে'।[১৪] অস্তিত্বের সংকট থেকেই জন্ম নেয় নতুন সংকল্পের – নতুন সংগ্রামের ।

৫. অনি : অসীম রায়

পশ্চিমবঙ্গীয় বামপন্থী রাজনীতিতে বামপন্থী এবং অতি – বামপন্থীর সংঘাত শুরু হয়েছিল প্রায় ষাটের দশকের শেষ থেকে । এই রাজনৈতিক বিশ্বাসের দ্বন্দ্বকে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক এবং আদর্শগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার এবং বিশ্লেষণ করেননি লেখক অসীম রায় তাঁর 'অনি' গল্পে। বরং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এইদুটি বিশ্বাসের মধ্যে যে আত্মিক সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল তা বাবা ও ছেলের রাজনৈতিক বিশ্বাসের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন । তরুণ অনিরা যেভাবে এখন স্বপ্ন দেখে অনির বাবারা সেই স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছেন । বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্তসুলভ একটি নিরাপদ গণ্ডীর মধ্যে সুস্থিত জীবনকেই একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত সত্য রূপে লাভ করতে চান । পক্ষান্তরে , অনিদের প্রতিস্পর্ধা তাকে ভীত করে , সংশয়ান্বিত করে । বইয়ের শেলফের মধ্যে ধুলো জমে থাকা লেনিন – স্ট্যালিন – মাও –জে-দং এর বইগুলো এখন বিদ্রূপের হাসি হেসে ওঠে বলে মনে হয় । তাই অনি – র আক্রমণাত্মক উক্তি বাবা – র অতীত আর বর্তমানের দুস্তর ব্যবধানকে স্পষ্ট করে তোলে – 'তোমার কি মনে হয় না বাবা , তোমার এই বর্তমান হাত কচলানো অস্তিত্বের সঙ্গে , সামান্য কয়েকটা পয়সার জন্য দরকার হলে দুর্নীতি করে এবং তাকে গালভরা যুক্তি দিয়ে সমর্থন করে

বেঁচে থাকার সঙ্গে এই সব বইয়ের কোন যোগ নেই , এইসব বই এরকম যাদুঘরে মানায় না; এইরকম মৃত বারবার একই বৃত্তের মধ্যে যান্ত্রিক সংক্রমণের সঙ্গে বিপ্লবের সফেন জোয়ারের কোনো যোগ নেই'।[১৫]

অনির বাবা বামপন্থী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন। অনির পাল্টে যাওয়া প্রতিনিয়ত তাকে আহত করে । পাড়ায় বোমা বিস্ফোরণ এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে পাড়ার সব ছেলেদের সঙ্গে অনিকেও জেলে তুলে নিয়ে পুলিসের অত্যাচার অনিকে তার আদর্শকে আরো সজোরে আঁকড়ে ধরতে সাহায্য করে । পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক ক্রমশই ক্ষীণ হতে থাকে । লেখক অসীম রায় বামপন্থী রাজনীতির দুর্বলতাকে খুব স্পষ্ট করে এই গল্পে উপস্থাপিত করেছেন। 'বাম রাজনীতিতে সব আক্রমণই বিধ্বংসী । প্রাথমিক পর্যায়ে উত্তপ্ত বাদানুবাদে সীমাবদ্ধ থাকলেও শেষপর্যন্ত শারীরিক নিশ্চিহ্নকরণে গিয়ে দাঁড়ায় এ আক্রমণ । স্পষ্ট দুটি ধারা , বৈরী এবং বন্ধু ছাড়া , তৃতীয় কোনো ধারার অস্তিত্ব নেই এখানে। যে বন্ধু নয়, সেই শত্রু । কিন্তু যে শত্রু নয়, নিঃশর্ত বন্ধুতা থেকেও দূরে, অন্তর্বতী স্তরে আছে, তাকে অনায়াসে বৈরী চিহ্নিত করে দেয় বাম রাজনীতি । এই রাজনীতির সমালোচনা মানে শত্রুতা, বন্ধুত্বের অর্থ শর্তহীন আনুগত্য'।[১৬]

তাই একদা বামপন্থী আন্দোলনের সমর্থক অনির বাবার বাড়িতেই ঘটল বামপন্থীদের আক্রমণ। যে দলের জন্য তিনি পথে নেমেছেন তারাই এখন অনির খোঁজে এসেছে লাঠি, লোহার রড, দা – ছোরা পাইপগান হাতে। এই চরম আত্মগ্লানিতে বিধ্বস্ত অনির বাবা উপলব্ধি করেছেন যে বিপ্লব তারা করতে চেয়েছিলেন–তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে । জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়েছে। অনির কথাই এখন সত্যি হয়ে ওঠে – 'তোমরা যে পথে গিয়েছিলে, সে পথে তো দেখলে, সে পথে খালি মিনিস্টার হওয়া যায়, বিপ্লব আসে না'।[১৭]

স্বাভাবিকভাবেই এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় দমন পীড়ণের তাণ্ডব চলেছে ছাত্রসমাজের উপর। এই দশকেই সব থেকে প্রাণহানি ঘটেছে ছাত্র ও যুবসমাজের । গল্পে

তাই অনির পরিণতি স্বাভাবিক। অনির মৃত্যু –র থেকেও এই গল্পের চমক অন্যত্র। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অন্য একটি মুখ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই গল্পে । নকশাল অনি–বিপ্লবী অনি মুহূর্তেই রাষ্ট্রের চক্রান্তে চোর অনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় । মর্গে হাঁক ওঠে – 'চোর অনি, চোর অনি– কেউ এসেছেন?' রাষ্ট্রের ঔদ্ধত্য এবং ক্ষমতার স্পর্ধা মুহূর্তেই নাকচ করে দেয় বিপ্লবের গৌরবকে , আন্দোলনের মহিমাকে।

৬. সন্তানের নাম ধান : বেণী দাশগুপ্ত

১৯৬৭ সালের ১৪ ই জুন নকশালবাড়ি আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরিতে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। যার উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রমিক ও ছাত্ররা। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল নকশালবাড়ির সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনকে অভিনন্দন জানানো। এই জনসভাতেই 'নকশালবাড়ি ও কৃষক সংগ্রাম সহায়ক সমিতি তৈরি হয়েছিল। নকশালবাড়ির ধাঁচের সমস্ত কৃষক সংগ্রামকে সক্রিয় সমর্থন এবং সহযোগিতা করাই ছিল সমিতির উদ্দেশ্য। নকশালবাড়ির সংগ্রামকে কেন্দ্র করে ছাত্রফ্রন্টে যে প্রবল বিতর্কের ঝড় উঠল, সেখানে মূল প্রশ্ন ছিল, শ্রমিক কৃষক, সাধারণ মানুষের নিপীড়ণকারী যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ছাত্ররা সমর্থন করবে, না নকশালবাড়ির বিদ্রোহী পথকে সমর্থন করবে? এই প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রসমাজ নকশালবাড়ির বিদ্রোহী রাজনীতির পক্ষে রায় দিয়েছিলেন'।[১৮] নকশালবাড়ি আন্দোলন তার প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করতে পারেনি। ভূমি সংস্কারের যে পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল তাও সম্ভব হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব গ্রামের মতই আমাদের আলোচ্য গল্পের গ্রাম 'ভাতুরে' তেও রয়েছে মদন দত্তের মত মজুতদার – জোতদার । যার কাছে এই গ্রামের প্রায় সবার ধন – মান – ইজ্জৎ এমনকি প্রাণও বাঁধা আছে। মদন কবল থেকে মুক্ত একমাত্র দেবু । গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার । লেখাপড়া জানে এবং লাল ঝান্ডার পার্টি করে । এছাড়া গ্রামের কৃষক সমিতির সক্রিয় সদস্য । তাই

দেবুকেই মদন একটু ভয় পায় । কিন্তু দেবুর মনেও রয়েছে সংশয়। সত্যিই কি পট পরিবর্তন সম্ভব । মদনের আগ্রাসী লোভ তো শুধু গ্রামের মানুষের জমির ধান, ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নেয়নি। গ্রামের ইজ্জৎ - সম্ভ্রমকেও সে করায়ত্ত করে নিয়েছে। তাই দেবুর ছাত্রী কিশোরী রাবেয়া ও দুকিলো চালের বিনিময়ে নিজের দেহকে মদনের লোভের সামনে মেলে ধরতে বাধ্য হয়েছে । অথচ মাঠ আজ ধানে পরিপূর্ণ । কিন্তু যারা এই ধানকে রোপন করেছে , লালন করেছে, পালন করেছে তারাই জানে না এই ধানের মালিক তারা কিনা ? দেবু, কৃষক নেতা ও মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে জেনেছে নকশালবাড়ির হঠকারি পথ দিয়ে আর চলা যাবে না। তাই সংগঠন যতদিন না শক্তিশালী হচ্ছে ততদিন কৃষক ছয়মাস ধান পাবে। তারপর জমি চলে যাবে জোতদারের হাতে । এই আপোসের পথ মেনে নিতে পারে না দেবু । সে উপলব্ধি করে পুলিসের সাহায্যে ধানের মালিকানা মদনের কাছে চলে যাবে । 'ফলে এই মুহূর্তে দেবু ঠিক করেছে আপোস নয় । মানবে না ত্রিপক্ষীয় চুক্তি । এরা রুখুক বুক দিয়ে ধান । এখন ওদের থামান মানে সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা । সংগ্রামের আর এক নাম সংঘর্ষ । ভবিষৎ সূর্যের উত্তাপের আশায় শুরু হোক সংগ্রাম'।[১৯]

৭. তরাইয়ের মা : শুকদেব চট্টোপাধ্যায়

বিপ্লবের উন্মাদনায় উদ্দীপিত যুবকেরা নকশালবাড়ির অভ্যুত্থানের পর কৃষি বিপ্লবকে সফল করার লক্ষ্যে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের পাশে থাকার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন । দেশের নিরক্ষর মানুষদের সাক্ষর করার কর্মসূচী যেমন গ্রহণ করা হয়েছিল তেমনি দরিদ্র ভূমিহীন খেত মজুরদের সঙ্গে থেকে গ্রাম জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করাও ছিল এই সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য । এই উদ্দেশ্যেই 'শ্রদ্ধেয় নেতার মহান আহ্বানে' হাজার হাজার তরুণের মত শান্তনু ও কল্যাণও পৌঁছে গিয়েছিল পশ্চিমবাংলার কোনো একটি হতদরিদ্র গ্রামে । এই আন্দোলনেই শহীদ হয়েছে কল্যাণ আর সেই মৃত্যু সংবাদই বহন করে নিয়ে এসেছে বন্ধু

শান্তনু কল্যাণের মায়ের কাছে । সেই মা যাকে কল্যাণ চিঠিতে লিখেছিল – ‘সারা পশ্চিমবাংলায় – সারা ভারতে লক্ষ গ্রামে ছড়িয়ে আছেন কোটি কোটি জনমদুঃখিনী মা । তুমিও তাদেরই একজন । সেই অশ্রুমুখী জননীর দুঃখ চিরতরে মুছিয়ে দিতে আমরা বিপ্লবের কাজে ঝাঁপ দিয়েছি । মা এ যুগ যে আমাদের ... বিপ্লবের আত্মত্যাগের’।[২০]

আন্দোলনকে সার্থক করে তোলার জন্য অসংখ্য তরুণ প্রাণ দ্বিধাহীনভাবে আত্মবিসর্জনের পথ বেছে নিয়েছিল । আর সেই অসংখ্য তরুণ প্রাণদের পরিবার যারা হয়তো প্রত্যক্ষভাবে আত্মত্যাগ করেননি কিন্তু অসংখ্য নিদ্রাহীন রাত্রি – যন্ত্রণা আর অসহায়ত্বের শিকার হতে হয়েছে তাদের প্রতিনিয়ত । কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থানগতদিক থেকেও তাদের একঘরে হতে হয়েছে। প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়েছে নিজের সঙ্গে এবং সমাজের সঙ্গে। সেই লড়াইয়ের হিসাব তো কেউ রাখেনি । যদিও তাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগই ছিল এই তরুণদের এগিয়ে চলার পিছনের মূল জীবনীশক্তি । ‘তরাইয়ের মা’ গল্পে এই সত্যটিই উদ্ঘাটিত হয় । তাই কল্যাণের জন্য মায়ের হাতে বোনা সোয়েটার মা শান্তনুর হাত দিয়ে পৌঁছে দিতে চান কোনো এক ভূমিহীন খেতমজুরদের কাছে । যাদের মধ্যেই কল্যাণ মিশে আছে ।

৮. বারো – বারো বছরের পর : অভিজিৎ সেনগুপ্ত

বন্দুকের নলকেই ক্ষমতার উৎস বলে স্বীকার করে যে লড়াইটা শুরু হয়েছিল, সবকিছুকে পাল্টে দেওয়ার লক্ষ্যে,শেষপর্যন্ত তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল । খুনের বদলে খুন – সমানাধিকারের সম্মান – সবাই কমরেড এই ভাবনার যে যোগসূত্রটা গড়ে উঠেছিল নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ,শ্রেণিশত্রুকে খতম করার মধ্য দিয়ে , মুক্তাঞ্চল গঠন করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, তা কতটা গ্রহণযোগ্য কিংবা সমর্থনযোগ্য তা নিয়ে সংশয়

এবং তর্ক তখনও ছিল আজ এই আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও আছে । তবুও একটি সত্যকে অস্বীকার করা যায় না এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল বুধন হেমব্রমের মত লক্ষ লক্ষ খেতমজুর এবং তরুণ যুবকেরা যারা গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরতে চেয়েছিল। একটা লং মার্চ হবে আর স্বপ্নটা বাস্তব হয়ে উঠবে। এই গল্পে মনের কোণে লুকিয়ে থাকা সেই স্বপ্নটা যে বেঁচে থাকে , বেঁচে থাকতে চায় তাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই বারো বছর ধরে যে স্বপ্নটা জিইয়ে রেখেছিল বুধন হেমব্রমের মতো খেতমজুর খরা – অনাহার – দারিদ্র্যের চরম সীমায় পৌঁছে বারবার ধ্বস্ত হতে হতেও বারো বছর আগের দেখা সেই বাবুটি, কমরেড সংগ্রামী বাবুটির সঙ্গে যখন আবার দেখা হয়, তখন সে বিশ্বাস করতে শুরু করে আবার একটি লড়াই হবে ।

কিন্তু সময় বড়ো নির্মম-নিষ্ঠুর । তাই বারো বছর আগের কমরেড নেতা আজ লেবার-ঠিকেদার। তার উপর দায়িত্ব শ – তিনেক লেবার যোগার করার । কিন্তু চাষের সময় এত লোক পাওয়া সহজ নয়। কিন্তু কন্ট্রাকটিং ইঞ্জিনিয়ার সান্যালের দাবি ‘ কাজ হাতে নিলে সেটাকে তো শেষ করতেই হবে মশাই – ইট ইজ নট আ রেভলিউশন ইট মাস্ট বি স্টার্টেড অ্যাণ্ড ফিনিশড়্’[২১] আর ভারতবর্ষের মতো দেশে লোক পাওয়া যাবে না সেটা অসম্ভব । আর যখন মুর্শিদাবাদ ,বাঁকুড়া ,বীরভূমকে খরাপ্রবণ এলাকা বলে বিরোধীপক্ষ প্রবল দাবি জানাচ্ছে। পুঁজিবাদী শ্রেণির কাছে কোনো খবরই অজানা নেই তাই লেবার ঠিকেদারের অতীত কাহিনি পুরোটাই এদের জানা। তাই কিছুটা পরিহাস করেই সান্যাল বলেছেন – ‘মুর্শিদাবাদেই তো বেসওয়ার্ক ছিল আপনাদের তাই না !তাহলে তো মশাই আর ঝামেলাই নেই – ফিলড তৈরি। তবে মোড়ল গোছের একজন কাউকে পাকড়াতে হবে – গাঁয়ের লোক এখনো সব ভেড়ার পাল’।[২২] তাই নতুন করে আবার বারো বছর পর কানুপুর (গ্রামের নামটাও ইঙ্গিতপূর্ণ) যাত্রা , মজুর সংগ্রহের জন্য । কিন্তু গ্রামে লোক কোথায় ? সবাই কি কানুপুর ছেড়ে শহরে চলে গেছে। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার স্বপ্ন আজ কোথায় বিলীন হয়ে গেছে।কিন্তু বুধনরা তো আজও

স্বপ্ন দেখে। তাই ফিস্‌ফিস্ করে বলে – 'সঙ্গে ইটা এনেছেন বাবু' । ইঙ্গিতটা আর স্পষ্ট হয় না বারো বছর পর । তবুও সচকিত হয়ে ওঠে প্রাক্তন কমরেড । জিজ্ঞাস্য থেকে যায় কি হবে আর পাইপগান দিয়ে ? বুধন আজও বিশ্বাস করে ওটাই শক্তির উৎস । কানুপুরের অভুক্ত কর্মহীন মানুষতো আজ 'ওটা' দিয়েই ডাকাতি করছে । বিপ্লবের এই নির্মম পরিণতি আমাদের চৈতন্যকে আঘাত করে , স্তম্ভিত করে । যদিও বাস্তব এটাই । বদলের স্বপ্ন বদলার স্বপ্নে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়াটাই আন্দোলনের পরিণতি নির্মাণে সহায়তা করেছিল কিনা তা তর্কসাপেক্ষ । তবুও এই আন্দোলন যে সম্ভাবনার বীজটিকে বপন করেছিল তার বিনাশ অত সহজসাধ্য নয় । কারণ যে সংকটকাল এই আন্দোলনের জন্মদাতা সেই সংকটের অবসান আজও হয়নি। তাই সংগ্রামের অমিত সম্ভাবনা আজও বিদ্যমান।

৯. অপ্রতিদ্বন্দ্বী : দীপংকর চক্রবর্তী

মধ্যবিত্ত আপাত শান্তিকামী মানুষ হিসাবে অন্যায়ের বিরোধিতা করার সাহস কিংবা আত্মত্যাগ করার প্রয়াস দুটিই আমাদের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে প্রায় শেখান হয় না বললেই চলে । নকশালবাড়ি – র আন্দোলন এই মধ্যবিত্তসুলভ গা বাঁচানো ভাবনা থেকে লক্ষ লক্ষ তরুণ যুবককে অন্যভাবে ভাবতে শিখিয়েছিল । একটা প্রতিরোধের আগুনকে অন্তরে জ্বালিয়ে দিয়েছিল । নকশাল আন্দোলনকে দমন করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক স্তর থেকে যে আইনি সন্ত্রাস চলেছিল তার ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার যুবক প্রাণ হারিয়েছিলেন । এই গল্পে 'বুলু' সেইরকমই একজন নকশাল কর্মীরূপে পুলিশের গুলিতে মারা যায় । বুলুর মৃত্যুসংবাদ পেয়েই বন্ধু সিদ্ধার্থ এসেছে কলকাতার শহরতলীতে বুলুর বাড়িতে ।

যাওয়ার পথে চোখে পড়ে দেওয়াল লিখনে ঢাকা সমস্ত নতুন নতুন বাড়ি । বিভিন্ন দলের বিবিধ বক্তব্য পড়তে পড়তে এগিয়ে চলে সিদ্ধার্থ – " 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব

জিন্দাবাদ। ULDF প্রার্থীদের ভোট দিন'। 'ভোট বয়কট করে নয়, ভোটের মাধ্যমেই আপনার রায় দিন। জনগণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করুন'। তারপরের লেখাটার ওপর আলকাতরা বোলানো। অনেক কষ্টে পড়ল সিদ্ধার্থ – 'তেইশ বছর ভোট দিয়ে আপনি কি পেয়েছেন ? ভোট নয় , সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবই মুক্তির পথ'। ও এটা বুলুদের পার্টির পোস্টার ! সবার পোস্টার অক্ষত , আর ওদের পোস্টারের ওপর আলকাতরা – কারণটা ঠিক বুঝল না সিদ্ধার্থ'' ।[২৩] সব রাজনৈতিক দলই নকশালদের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতার পথ গ্রহণ করতে শুরু করেছিল । পুলিসের সঙ্গে কংগ্রেস ও বামদলগুলিও নকশালপন্থী ছাত্রদের নিধনে নেমে পড়েছিল । সবচেয়ে প্ররোচনা এসেছিল মার্ক্সবাদী দলের কাছ থেকে। ময়দানের জনসভায় প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছিলেন , 'নকশালপন্থীদের পুলিস আমাদের হাতে তুলে দিলে আমরা চব্বিশ ঘন্টায় তাদের ঠাণ্ডা করে দেব'।[২৪] এই চরম বিরোধিতার মধ্যেও বিপ্লবের সূর্য অস্তমিত যায় না । প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ক্ষেত্র । তাই বুলুর বাড়ির পথপ্রদর্শক বিচ্ছুরা আজও বিলুর প্রদর্শিত পথকে অনুসরণ করে চলেছে । একজন বিলুর হত্যার পর হাজার হাজার বিচ্ছু প্রস্তুত আছে । তাই নির্যাতন করে বিপ্লবের জোয়ারকে রোখা যায় না । এই দেওয়াল লিখনকে মোছা আজ অসাধ্য । উদ্ভাসিত বিপ্লবের সূর্যরেখাকে দমন করার ক্ষমতা আজ কারোর নেই । তাই ওরা 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী' ।

১০. সবুজ দ্বীপের মাঝি : বারিদবরণ চক্রবর্তী

নকশাল আন্দোলন এই গল্পটির কেন্দ্রবিন্দুতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাচক্র হিসাবে নির্ধারিত হলেও ব্যক্তিমানুষের স্বপ্ন – হতাশা – ক্রোধই এই গল্পের মূল অভিমুখ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে । একদা নকশাল আন্দোলনের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েছিল বামপন্থী নকুলের বাবা – নিতাই হালদার । যদিও পরবর্তীকালে তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন এবং পুরাতন বামপন্থী শিবিরে ফিরে আসতে চান । কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে ।

পার্টির নির্দেশে বিভাস খুন করেছে নকুলের বাবাকে । তখন নকুল দশ – বারো বছরের কিশোর । আজ আঠারো বছর পরে বিভাস আবার ফিরে এসেছে সেই শুখানিয়া গ্রামে । আবার দেখা হয়েছে নকুলের সঙ্গে । যদিও বিভাসের বিশ্বাস নকুল তাকে চিনতে পারেনি । এই গ্রাম জেলেদের গ্রাম । মাছ ধরাই এই গ্রামের প্রধান উপার্জনের পথ । সাতষট্টি সালে প্রথম যুক্তফ্রন্টের সময় নকুলের বাপ ঠাকুরদাদারা হরেকৃষ্ণ কোঙারের কাছে দাবি জানিয়েছিল এই কোলবিলের নিঃশর্ত ভোগদখলের অধিকার । বিনা পয়সায় এই দহর অধিকার দেওয়া সম্ভব নয় জানিয়েছিলেন হরেকৃষ্ণ কোঙার । কারণ 'এখন সবই সরকারের খাস। সরকারের খাস জমির বন্দোবস্ত দিতে হয় টেন্ডার ডেকে , টেন্ডার মানে বোঝো তো – দরাদরির হাঁকাহাঁকির চিঠিচাপাটি – সেখানে যে বেশি মূল্য দিতে কবুল করে তাকেই বাঁধা সময়ের জন্য মালিকানা ছেড়ে দিতে হয় । যদি তোমরা বিনা পয়সায় ভোগদখলের মতলব ছেড়ে দিয়ে নামমাত্র খাজনায় - ধরো কিনা বছরে একর পিছু দশটাকা এমনিতরো কিছু একটা ! – তবে রাতারাতি নোটিশ করে তোমাদের দিয়ে দিতে পারি , নিজেরা ভাবো , ভেবেচিন্তে এককাট্টা হয়ে আমার কাছে এসো । সেই হল কিনা কোলবিলের একালের সূত্রপাত'।[২৫]

আজ আঠারো বছর পর বিভাস এখানে এসেছে আটাত্তরের বন্যায় হঠাৎ গঙ্গার বুকে ভেসে ওঠা একটি চরের সন্ধানে । এর নাম দেওয়া হয়েছে সবুজ দ্বীপ । এই সবুজ দ্বীপকে কেন্দ্র করে এই এলাকার মানুষ নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে । সেই নতুন স্বপ্নের কাজল লেগেছে নকুলের চোখেও । বাবার হত্যাকারীরূপে বিভাসকে সে নিশ্চিতভাবেই চিহ্নিত করেছে । কিন্তু বাবার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার লক্ষ্যে সে বিভাসকে হত্যা করতে পারে না । তার মনে তৈরি হয়েছে একটি দ্বন্দ্ব – 'জানেন , আপনাকে চেনার পর থেকেই আমার মধ্যে কী ঝড় তুফান শুরু হয়ে গেছে । দু –পা এগোচ্ছি তো চার – পা পিছিয়ে যাচ্ছি । কিছুতেই ভুলতে পারছি না বাপের সেই খুনিটাকে । আবার কিছুতেই ভুলতে পারছি না , চর নোয়াপাড়ার ওই সবুজ স্বপ্নটাকে । ভুলতে পারছি না , ওই নতুন দ্বীপটাকে গড়ে তোলার

কাজে আমি নিজেকে একেবারেই বিলিয়ে দিয়েছি – এমন কিছু কাজ আমি করতে পারি না যাতে ওই গড়ার কাজ একটা দিনের জন্যে হলেও থমকে যায়' ।[২৬]

সবুজদ্বীপকে কেন্দ্র করে আগামীতে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের বৃহত্তর সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যেই নকুল তার সমস্ত ক্রোধ এবং প্রতিশোধস্পৃহাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে । বৃহত্তর স্বার্থের লক্ষ্যে সে তার ব্যক্তিগত রাগ দুঃখকে সংবরণ করেছে । তাই নকশাল আন্দোলনকে অতিক্রম করে এই গল্পটি আসলে মানুষের ভালো থাকার এবং ভালো রাখার স্বপ্নকেই চিরন্তন করে রেখেছে । আর এইজন্যই তো গড়ে ওঠে প্রতিটি সংগ্রাম ।

১১. ছোট বকুলপুরের পরের কথা : সিদ্ধার্থ সাহা

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুল জনপ্রিয় ছোটগল্প 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' গল্পটি । এই গল্পে দিবাকর ও আন্না সংগ্রামী নেতৃত্বকে সমর্থন জানানোর লক্ষ্যেই হোক কিংবা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই হোক ছোটবকুলপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল । 'কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হয় না , কেননা সম্পত্তি ব্যবস্থার ধারকবাহক এবং রক্ষকদের সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং খুবই সম্ভব যে , সে ও আন্না বদমায়েশদের হাতে উপহাসিত ও যার পর নাই লাঞ্ছিত হয়েছিল'।[২৭] গল্পকার এই বক্তব্য পেশ করার পর অভিনবভঙ্গীতে ছোট বকুলপুরের পরের সংগ্রামের ইতিহাসকে তুলে ধরতে চেয়েছেন । পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পূর্বতন আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে প্রায় দুই দশক পরে আবার দুইজন যাত্রী হেমন্ত ও গোপাল রিদেপুর পৌঁছবে বলে প্রস্তুত হয় । তবে এরা অনেক অভিজ্ঞ । পূর্বতন আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে অনেক বেশি সতর্ক এবং পরিস্থিতি সচেতন ।

বিপ্লবকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তাদের গন্তব্য রিদেপুর । কিন্তু প্রতিরোধও প্রস্তুত । প্রশাসনিক তৎপরতাও তুঙ্গে , তাই প্রতিটি গ্রামে তৈরি করা হয়েছিল ডিফেন্স পার্টি । যারা গ্রামে নতুন কেউ এলেই খোঁজখবর নেয় । প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাদের সমস্ত খবর সংগ্রহ করে । গোপাল ও হেমন্ত অবশ্য সব প্রস্তুতি নিয়েই উপস্থিত হয়েছিল রিদেপুর গ্রামে । শহর থেকে কেন তারা এই গ্রামে এসেছে এই প্রাথমিক প্রশ্নের উত্তর তাদের তৈরি ছিল । এই গ্রামের নিবারণ মিস্ত্রির সঙ্গে তারা কাজ করবে বলে এসেছে । হেমন্ত-র বক্তব্য অনুযায়ী রিদেপুরে কাজের অভাব নেই । অনেক পাকাবাড়ি হবে , আর কিছু মেরামতের কাজও হবে । নিবারণের সহযোগী হিসাবে তারা কাজ করবে। রিদেপুরের পরিপ্রেক্ষিতে কথাগুলি মিথ্যা নয়। কারণ এখানে অনেকগুলো পাকাবাড়ি হওয়ার সম্ভাবনা সত্যিই তৈরি হয়েছে । এই সপ্রতিভ উত্তর স্বাভাবিকভাবেই ডিফেন্স পার্টির মনে ধন্দের সৃষ্টি করে । 'এই দুইটারে তো সেই লোক মনে হয় না । বড়োবাবু যাদের কথা দিনরাত্র পাড়েন । বীরভূম বাঁকুড়ার নতুন মাইনসের কোনও গন্ধ তো এদের শরীলে পাই না রে । বড়ো ধোঁকা লাইগত্যেছে' ।[২৮]

বড়ো অসহায় লাগে ডিফেন্স পার্টির লোকেদের । এই অচেনা মানুষদুটি সব প্রশ্নেরই সদুত্তর দিয়েছে আর যারা এই জেলায় কাজ করবে বলে বেছে নিয়েছে তারাও তো চেনা মানুষ নয় । 'যদিও তাদের দুটি পা , দুটি হাত , দুটি কান , একটি নাসিকা এবং এই অঞ্চলের মানুষের মতোই তারা অসহনীয়ভাবে উৎপীড়িত , দারিদ্র্যভারে তাদের শরীরও গেছে নুয়ে , মন হয়ে গিয়েছে শুষ্কং । রিদেপুর ডিফেন্স পার্টির লোকেরা হিসাব মেলাতে পারে না । কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় এবং কেবল নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে '।[২৯] শেষপর্যন্ত সন্দেহের তালিকা থেকে গোপাল ও হেমন্তকে বাদ দিতেই হয় । তবে গল্পের শেষ এখানেই নয় । লেখক পরিশিষ্ট অংশে গল্পের অন্য পিঠটির সঙ্গেও আমাদের পরিচয় করান । আজকাল ডি.এম অফিসের তৎপরতা , চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পেয়েছে । কারণ এস.পি সাহেবের কাছে খবর এসেছে - রিদেপুর বারুদের স্তূপের উপর বসে আছে । স্পষ্টতই হতাশ ডি.এম মিস্টার

ব্যানার্জি – কারণ তারা প্রশাসনিক স্তর থকে নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা করেছিলেন । পাড়ায় পাড়ায় ডিফেন্স পার্টি গড়ে তুলেছিলেন । তবুও ওরা বোকা বানিয়ে দিয়েছে । এই অকুতোভয় আন্দোলন মুক্তি আনবেই আজ না হয় কাল । এই অধিকার রক্ষার লড়াই , আত্মমর্যাদার লড়াই কোনও কৌশলেই নিষ্প্রভ হবে না । নতুন অভিজ্ঞতা দিয়েই পুরাতন ব্যর্থতা মুছে যাবে।

১২. রতনলাল – স্বপন চক্রবর্তী

যে অধিকারের লড়াই, সংগ্রামের তীব্রতায় বিপুল জনসমর্থন লাভ করেছিল নকশালবাড়ির অভ্যুত্থান, শেষপর্যন্ত তা সন্ত্রাস – আর মৃত্যুর মিছিলের মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেল । রয়ে গেল বামপন্থী দলগুলির মধ্যে ক্ষমতা ও অধিকারের দ্বন্দ্ব । পার্টি বারবার ভাঙল । সি.পি.আই , সি.পি.আই (এম), সি.পি.আই (এম এল) ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির এই টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া সৃষ্টি করল এক ঘৃণা আর বিদ্বেষের রাজনীতি । দলগুলির মধ্যে তৈরি হল অবিশ্বাস আর সন্দেহের বাতাবরণ । ফলে খেটে খাওয়া মানুষের লড়াই গৌণ হয়ে গিয়েছিল । নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এবং ক্ষমতার অলিন্দে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করার আকাঙ্ক্ষায় যেকোনো উপায় অবলম্বন করার প্রবণতা এই সময়ের খুব স্বাভাবিক একটি প্রবণতারূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে । তাই রতনলালের মতো ভূমিহীন চাষি পরিবারের ছেলে যারা চিন –ভারতের যুদ্ধের জন্য দেশের জন্য বিনা প্রস্তুতিতেই লড়াই করতে চেয়েছিল। মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পার্টির কাজে আত্মোৎসর্গ করতে চেয়েছিল । তাদেরও ভুল ভাঙল । যখন পার্টি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। রতনলালেরও মোহভঙ্গ ঘটল । সে কর্মী হিসাবে ইস্তফা দিল এবং ব্রাঞ্চ কমিটিকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিল – ‘জনস্বার্থ বিরোধী সংবিধানের মধ্য দিয়ে তৈরি করা প্রশাসন কখনই জনগণের মৌল অধিকারের প্রতিষ্ঠা দেয় না । এটা হল গ্রামীণ সরলমতি কৃষকদের ঠকানো আর সামন্ত বুর্জোয়াদের মনোরঞ্জনের

জন্য গ্রামীণ যাত্রায় ব্যাটাছেলের মেয়ে সেজে নাচার মতোই এক চমক সৃষ্টির প্রয়াস ; দেউলিয়াপনা'।[৩০] আর এই চিঠির শেষে 'অভিনন্দন সহ' কথাটি লিখলেও নিজের নামের আগে কমরেড কথাটি লিখেও সে কালি দিয়ে কেটে দিল । সংগ্রামকে হাতিয়ার করে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ , জোতদারের হাত থেকে বেনামি জমি উদ্ধার এবং কৃষকদের জমির উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার যে লড়াই তা শেষপর্যন্ত কৃষকদের দুবেলা খাবার সংস্থান ও করে উঠতে পারলো না। রতনলাল তার গ্রামে এমন একটিও সংসার পেল না যেখানে দুবেলা হাঁড়ি চড়ে । কিন্তু এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের জন্য তৈরি হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক দলগুলি । রতনলাল বিকল্প একটি পথের সন্ধান করতে চাইল । রাজনৈতিক ভাবে সশস্ত্র হয়ে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার লড়াইতে সে সামিল হতে চাইল । প্রশাসনিক সন্ত্রাস তাকে জেলবন্দী করে । আটাত্তরের শেষে সে যখন ছাড়া পায় দেখে তখন দেষে সবুজ বিপ্লব হয়ে গেছে । চলছে আর একটা রাজনৈতিক চক্রান্ত। "শ্রেণী সংগ্রাম নয় , বরগা – আপস । এরা সব কৃষকের আক্রোশ থেকে জমিদারদের রক্ষা করার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি । এরা পারিবারিক শাসনকে প্রশ্রয় দেয়,স্বৈরতন্ত্রের গাঁটছড়ার সঙ্গে এরা বাঁধা । সে বোঝে ,'প্রতিটা পদক্ষেপ এখন সতর্কতার"।[৩১]

রতনলালের সতর্কতা শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায় । বিরোধী সমিতির লোকেরা এক হয়ে হত্যা করে রতনলালকে । মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত রতনলাল স্বপ্ন দেখে গ্রামের লোকেদের সঙ্গে শেষদিন অবধি থাকতে হবে ওদের আস্থা অর্জন করার জন্য । রাজনৈতিক হিংসা প্রতিহিংসার চক্রান্তে সাধারন মানুষের স্বার্থ যে বারে বারেই রাজনৈতিক দলগুলির স্বার্থের সংঘাতে ব্যাহত হয়েছে, এই তাৎপর্যপূর্ণ সত্যটিই এই গল্পে বাস্তবায়িত হয়েছে । রতনলালরা জানে আধা – ঔপনিবেশিক, আধা – সামন্ততান্ত্রিক এই বিরাট দেশে যদি কৃষকদের পাশে থাকা যায় তাহলে তারাই হয়ে উঠবে অপ্রতিরোধ্য । কোনো শক্তি – ই তাদের প্রতিহত করতে পারবে না ।

১৩. হাবা : একলব্য ঘোষ

নকশাল আন্দোলনের কর্মসূচী ছিল শহর থেকে গ্রামে গিয়ে গ্রামের মানুষদের এই আন্দোলনে শরিক করা । দীর্ঘলালিত যে অন্যায় আর শোষণের ইতিহাস পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তারই বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদের ভাষা নয় , শ্রেণিশত্রুকে হত্যা করার প্রচারাভিযানও চালানো হয় । হিংসার প্রত্যাঘাতে প্রতিহিংসা এবং হত্যার রাজনীতিতে এক ভয়ের আবহ নির্মাণের প্রচেষ্টা পাশাপাশি এটাও বিশ্বাস করানোর প্রয়াস ‘ শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত রাঙালেই কমিউনিস্ট হওয়া যাবে’।[৩২]

এই খতমের রাজনীতি দিয়ে নকশালবাড়ির আন্দোলন যে সার্থক হয়ে ওঠেনি তা আজ অর্ধশতাব্দী পরে প্রমাণিত । কিন্তু তৎকালীন গ্রামীন যুবকদের মধ্যে এই আন্দোলন যে প্রবল উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল তা লেখক তাঁর ‘হাবা’ গল্পটির মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন । ‘হাবা’ যার আসল নাম কার্তিক , কালের বিবর্তনে খসে পড়েছে । রয়ে গেছে শুধু হাবা – কারন তার চিন্তার সামর্থ্য স্বল্প । তাই লেখকের উপলব্ধি ‘ আসলে সে যদি কোনও দিন চিন্তার সামর্থ্য পায় কিংবা তার জন্যে যদি কেউ ভাবনা করে তবে এটাই পরিষ্কার – তার কোনও জালে প্যাঁচালো বুদ্ধি নেই , সাংসারিক প্রক্ষেপে যা শুধু বুদ্ধি বলে বিবেচ্য’।[৩৩] এই কারণেই সে হাবা । এ হেন হাবা যার বাস্তববুদ্ধি বাস্তব জগতের মানদন্ডে শূন্য । সেও এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নকশালদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামের এক ধনী ব্যক্তিকে অন্যান্য নকশালদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে হত্যা করেছে । শ্রেণি বৈষম্যের ঘৃণাকে উসকে দিয়ে , ক্ষমতা দখলের লড়াইকে , খতমের লড়াইতে রূপান্তরিত করার যে ইতিহাস তা ছিল এক স্বপ্নের ইতিহাস । বিশ্বাস ছিল এই পথেই একমাত্র ‘মানষের ভালো হবে – গরিব মানুষের’।[৩৪]

নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে, ছাত্র-যুবক – কৃষক – শ্রমিকের সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে মুক্তির জয়গান রচনা করতে চেয়েছিল । তার গৃহীত কর্মসূচী বা পন্থা কতটা কার্যকরী বা ন্যায়বিচারের মানদণ্ডে তা গ্রহণযোগ্য কিনা তা কখনোই তর্কাতীত নয়।

তবুও এই ভাঙনের কাল তার সীমাবদ্ধতা নিয়েও গড়তে চেয়েছিল এমন এক প্রত্যয়কে যার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সমাজবদলের স্বপ্ন। মুক্ত, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ভারতের স্বপ্ন ।

১৪. মায়ের জন্য : ভগীরথ মিশ্র

শোষণের ইতিহাসে নারী বোধহয় আদিতম ভোগ ও দখলের বস্তু। ভগীরথ মিশ্র তাঁর 'মায়ের জন্য' গল্পে নারী – র রূপকের আড়ালে দেশের মাটি – র অধিকারের কাহিনিকে অসাধারণ ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করেছেন। এই গল্পে দুটি কাহিনি সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছে। একটি ষষ্ঠী বাউরি-র মায়ের গল্প অন্যটি কথকের মায়ের গল্প। যদিও শেষপর্যন্ত দুটি গল্পই কোথাও মিলেমিশে এক হয়ে যায়। জাতিগত প্রভেদ ষষ্ঠী বাউরি ও কথকের মধ্যে রয়েছে। ষষ্ঠী বাউরি অশিক্ষিত , জন্মপরিচয়ও স্পষ্ট নয়। কারণ গাঙ্গুলি গড়ের মেজো কর্তা এবং তার সঙ্গীদের নিত্য ভোগের সামগ্রী ছিল ষষ্ঠী বাউরির মা। তারই পরিণাম ষষ্ঠী বাউরি। অন্যদিকে কথক শিক্ষিত। কিন্তু তার বাড়ি মতিন বাবুর কাছে বাঁধা পড়ে আছে। মতিন বাবু বাড়িটিতে কথক এবং তার মাকে থাকতে দেন বটে কিন্তু মাথা গোঁজার অধিকারটুকু ছাড়া আর কোনো অধিকারই অবশিষ্ট রাখেননি মতিনবাবু। তাই জাতিগত ও শিক্ষাগত প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও শোষণ ও বঞ্চনার মানদণ্ড দুজন একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে।

একটি খেজুর গাছের অনুষঙ্গে লেখক এই শোষণের ইতিবৃত্তকে তুলে ধরেছেন। ষষ্ঠী বাউরির একটি খেজুর গাছ আছে। প্রতিবছর তার থেকে রস শোষণ করে করে আজ তার একেবারে শুকনো শরীর। কথক ষষ্ঠী বাউরিকে গাছটা আর ইজারা দিতে নিষেধ করে। কারণ গাছটা তাহলে আর বাঁচবে না। কিন্তু খিদের জ্বালা এমনই অনন্ত যার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। তাই সে বলে – 'গাছ তো গাছ, এখন যদি কেউ মোর পেটে – ধরা মা – টাকে ইজারা লিতে চায় যদি সিই সুবাদে হাতে গুঁইজে দেয় এক কুড়ি ট্যাকা , তো লিতে

হব্যেক ট্যাকাটা । খিদার বাড়া আগুন , আইজ্ঞা , নাই এই বিশ্ব – সন্‌সারে । লিমেষে খাণ্ডব দহন কইর্‌তে পারে উ'।[৩৫] অন্যদিকে মতিনবাবুর অভিযোগের ভিত্তিতে কথকের জেল হেফাজত হয় । কারণ কথকের অপরাধ নিজের ভিটে থেকে মতিনবাবুকে উঠে যেতে বলেছিলেন এবং মতিনবাবুর হাস্কিং মিলের দেওয়াল শাবলের ঘা মেরে ফাটিয়ে দিয়েছিলেন । এরই ভিত্তিতে বাঁকুড়া কোর্টে কথকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় দশ – বারোটা ডাকাতি – ধর্ষণ আর রাহাজানির । এছাড়া সব থেকে মারাত্মক অভিযোগ হল বিষ্টুপুর থেকে তালডাংরা পর্যন্ত তিনি গড়ে তুলেছেন এক বিশাল উগ্রপন্থী ঘাঁটি । অনেকদিন বাদে জেল থেকে ফিরে নিজের ভিটেয় স্থান হল না কথকের । কারণ ততদিনে তার পৈত্রিক ভিটে মতিনবাবু দখল করে ভিটের কোণে কথকের মাকে একটি কুঁড়ে ঘর বানিয়ে দিয়েছেন ।

অথচ স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশ তো সমৃদ্ধ হচ্ছে । উন্নয়নের জোয়ার লেগেছে পথে – প্রান্তরে – মাঠে অথচ তার ছিটেফোঁটাও এসে পৌঁছয়নি ষষ্ঠী বাউরিদের হাতে । জীবন যাপনের নূন্যতম প্রয়োজনটুকুও পূরণ হয় না ষষ্ঠী বাউরিদের । এই মানুষগুলির প্রতি নির্মমভাবে উদাসীন সমাজ – প্রশাসন ও সরকার। তাই কথক ও ষষ্ঠী বাউরি মিলে স্থির করে এখান থেকে চলে যেতে হবে । অন্য কোথাও গিয়ে খেটে রোজগার করে বাঁচতে হবে । কিন্তু ভোরের আলো ফোটার আগেই কথকের কুঁড়ে ঘরে পুলিসের আগমন । সমস্ত কিছু আঁতিপাতি করে খুঁজে বললেন – "এসেছিলুম এদিকে একটা কাজে। ভাবলুম , একটিবার ঢুঁ মেরে যাই । শুনছি নাকি খুব মিটিং শুরু করেছ লেবারদের নিয়ে ! সত্যি ?' – বলতে বলতে খবরের কাগজের একটি জায়গায় এসে চোখ আটকে গেল বড়বাবুর । কেন্দ্রীয় গুদামে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য ...

"খবরটার তলায় লাল কালির দাগ দিয়েছিলাম আমি । খবরটা খুব রোমাঞ্চকর মনে হয়েছিল আমার কাছে । ভুরু কুঁচকে উঠেছে বড়োবাবুর, আমারদিকে কয়েক পলক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন । তারপর বললেন, 'এই কাগজটাকে আমি বাজেয়াপ্ত করলাম"।[৩৬]

এই নিরীহ কাগজটির প্রতি সন্দেহ অথচ মতিনবাবুর চোরাই চালের ট্রাক বড়োবাবুর সামনে দিয়ে কলকাতায় চলে গেলেও তিনি নিস্পৃহ । এই চরম অন্যায়ের বিরুদ্ধে কি পালিয়ে বাঁচা যায় । তাই কথকের যাওয়া হয় না অন্য কোথাও । ষষ্ঠী বাউরিকেও নিবৃত্ত করেন কথক মাকে ছেড়ে যেতে । ষষ্ঠী বাউরিকেও নিবৃত্ত করেন কথক মাকে ছেড়ে যেতে । ষষ্ঠী বাউরি বুঝতে পারে না বলে – "ইদেশে থাইকলে একদিন নির্ঘাত মইরে যাব আইজ্ঞা'।

"-না মরব না । আমি প্রগাঢ় আস্থায় উচ্চারণ করি, 'ঘরে ফিরে যা তুই । সব্বাইকে খবর দে । আজ রাতে কাওয়াশোলের জঙ্গলে মিটিং হবে"।[৩৭]

১৫. প্রসব : স্বর্ণ মিত্র

'তেভাগা' আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারাণের নাতজামাই' একটি যুগান্তকারী গল্প । ময়নার – মা-র প্রত্যুৎপন্নমতিত্বতায় আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম । সেই মুগ্ধতারই আস্বাদ দ্বিতীয়বার যেন লাভ করা গেল স্বর্ণ মিত্রের 'প্রসব' গল্পের 'আন্না' চরিত্রটির মধ্য দিয়ে । প্রতিটি আন্দোলনেরই যেমন একটি প্রত্যক্ষ সংঘাতের দিক আছে তেমনই আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য পরোক্ষভাবে কতগুলি কৌশলগত দিকও নির্ধারণ করতে হয় । সশস্ত্র আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন অস্ত্রের । সীমান্ত রক্ষীদের সতর্ক দৃষ্টির সামনে গর্ভবতী মহিলা – র নিখুঁত অভিনয় করে এই গল্পের আন্না । প্রায় দেড়শো বছর আগের হুল বিদ্রোহের নেতা সিদুমাঝি – কানুমাঝিদের এই হৃদয়পুর অঞ্চলেই আবার নতুন করে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে । আর এই আন্দোলনেরই একজন কর্মী আন্না–র উপর দায়িত্ব অস্ত্র সরবরাহের । সীমান্ত রক্ষীদের চোখ এড়ানোর জন্য সে গর্ভবতী মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করতে থাকে । কম্যান্ডার সাহেবের কাছে সে কাতর স্বরে বলে – 'বাবু মোকে ছাড়ি দে ! মোর অ্যাকটা ছানাও নাই বাঁচল । ইটাও যদি মরে,

তাইলে মোর কী থাকল । ও বাবু – মুই কোনও পাটিতে নাই । কোনও বজ্জাতের সঙ্গি মোর সাক্ষাৎ নাই । মোকে সাচ্ করবি ?’[৩৮]

অনেক জানা অজানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শেষপর্যন্ত সন্ধ্যা নাগাদ আন্না নিজের ভিটেয় ফেরার জন্য ছাড়া পেল । তারপর জঙ্গলের দীর্ঘপথ পেরিয়ে তার সংগ্রামের সঙ্গীদের সামনে – ‘পোয়াতি আন্না প্রসব করল – চারটে রিভলভার, অনেকগুলো দলিলপত্র এবং - আপত্তিকর লাল বই’।[৩৯] তথাকথিত আর্থ – সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের প্রান্তিক বিন্দুতে অবস্থিত ‘আন্না’–র এই কৌশলগত সংগ্রামের উপস্থাপনা নিশ্চিতভাবেই এই আন্দোলনের নৈতিক জয়কেই ঘোষণা করেছে ।

১৬. সূর্যসেনা : তিমিরবরণ সিংহ

দীর্ঘ দীর্ঘ দিন ধরে যে শোষণের ইতিহাস চলে আসছে , সেই শোষণের ইতিহাসটিকেই পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে ‘সূর্যসেনা’ গল্পে । যে মাটি– র অধিকার থেকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত সাঁওতালরা, তাদের সেই বঞ্চনার বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের সংগ্রামই এই গল্পের মূল উপজীব্য । গল্পে গ্রামটির কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান কিংবা নাম দেওয়া হয়নি । সাঁওতালদের গ্রাম বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে । কারণ গ্রামের নাম – অবস্থান – জাতিগত পরিচয় পরিবর্তিত হলেও শোষণের ইতিবৃত্ত বদলায় না । কিন্তু আজ বদলের ইতিহাসটাই গড়তে হবে ।

এই বেঁচে মরে থাকা মানুষগুলির জীবন ইতিহাসটা বদলাবার জন্য এই গ্রামে এল মাও– সে তুং – এর আদর্শ নিয়ে একটি ছেলে। ‘বলল, - লড়তে হবে। বলল,- অস্তর হাতে নিতে হবে, এককাট্টা হতে হবে, লড়তে হবে জান কবুল করে – এটা ইজ্জতের লড়াই। দেখ, তোদের বাপদাদাদের রক্ত লেগে আছে এ মাটির সঙ্গে, এই মাটিতে তোদের রক্তের ফসল

ওঠে !'[৪০] স্বার্থপরের মতো মরে গেলে চলবে না। মরতে হবে সমস্ত গরিব ভাইদের জন্য। তাই জেগে থাকতে হবে – লড়াই করতে হবে – অনুশোচনা করে কালাতিপাত করার দিন এখন নয়। ছিনিয়ে নেওয়ার দিন এখন। প্রতিটি হত্যার হিসাব নেওয়ার দিন এখন। আগুনের মতো জ্বলে ওঠার দিন – তবেই এই দাসত্বের থেকে মুক্তি। শোষণের ইতিহাসটাকে বদলে দেওয়ার প্রয়াসই এই গল্পের মূল উপজীব্য। 'সূর্যসেনা' –রাই পারবে নতুন ভোরের সূচনা করতে কিংবা নতুন কোনো উৎসবের।

১৭. চাষীর গল্প : স্বর্ণ মিত্র

সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে রূপান্তরিত করার যে স্বপ্ন নকশালপন্থীরা দেখেছিলেন , বাস্তবে তা পূরণ হয়নি। সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কৃষি বিপ্লব ঘটাতে হবে। দীর্ঘলালিত শোষণকে পরিবর্তিত করে নতুন গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই সমস্ত সংগ্রামের ভাষা, প্রতিবাদের ভাষা শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গেছে। যদিও আন্দোলনের পরেও অনেকের মনেই এই আন্দোলন পুনর্জীবিত হবে এরকম একটি স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত অবস্থায় নিহিত ছিল কিংবা আজও আছে। সেই বিশ্বাস থেকেই বলা যেতে পারে লেখা হয়েছে স্বর্ণ মিত্রের 'চাষীর গল্প' টি। এই গল্পের কথক ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে বেড়াতে গিয়েছিলেন তার শহরের স্কুলের সহকর্মী অধীর ভট্টাচার্যের বীরভূমের দক্ষিণাংশের এক গ্রামে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গ্রামজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাহীন চাষির জীবন নিয়ে লেখা তাঁর অত্যন্ত প্রশংসিত গল্প তিনি গ্রামের চাষিদের পড়ে শোনাবেন। এই গ্রামে এসে তাঁর চুনার লায়েক নামে এক দাদন মুনিষ বা ভূমিদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে। তিনি চুনার– কে গল্প শোনানোর জন্য যতবার চেষ্টা করেছেন , ততবারই ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ চুনারের 'ফুরসৎ নেই'।

বাস্তবিকই চুনার লায়েকের সময় নেই । বংশানুক্রমিক দাস প্রথার শিকার চুনার । বাবার করে যাওয়া ঋণের দায়ভার মাথায় নিয়ে বাবুদের কেনা মুনিষে রূপান্তরিত হয়েছে চুনার । তাই এক কৃষক প্রভুর থেকে অন্য কৃষক প্রভুর বাড়িতে বাড়িতে ফাইফরমাস খাটতে খাটতেই তার সময় চলে যায় । নিশ্চিন্তে বসে গল্প শোনার বা করার অবসর তার নেই । এটাই বাস্তব । তাত্ত্বিক দর্শন আর বাস্তবের প্রতিফলনের মধ্যে ফারাকটা অনেকটাই। সেই বোধ থেকে আজ উপলব্ধি হয় নকশাল আন্দোলনের জন্য গ্রামে আসা যুবকদের মতো যদি কথক চুনারের সঙ্গে মিশে যেতে পারত তার বাড়িতে এসে তার দাওয়ায় বসে কিংবা তার সঙ্গে সঙ্গে আগাছা সরাতে সরাতে গল্পটা শোনাতো তারপর নাহয় যেমন বৈঠক হয় তেমন করে কোনো ফাঁকা সন্ধ্যায় গল্পটা পড়া যেত অন্যান্য সাথীদের সাথে । এছাড়া তো সময় পাওয়া যাবে না। এই আন্দোলনের ব্যর্থতার পরেও লেখকের কোথাও না কোথাও যে আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি বর্তমান তা প্রকাশিত হয়েছে এই গল্পটিতে। চুনার লায়েকের জীবনের অভিঘাত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়নি। তবুও এই বঞ্চনার ইতিহাসে নকশাল আন্দোলন যে প্রত্যাঘাত এনেছিল তার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি ও এই গল্পটির পরম প্রাপ্তি ।

১৮. আটটা নটার সূর্য : স্বর্ণ মিত্র

শ্রেণিসংগ্রামকে হাতিয়ার করে যে বিকল্প রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নকশালবাড়ি আন্দোলন দেখেছিল আজকের প্রেক্ষিতে তা বাস্তবায়িত হয়নি । আজ প্রায় পঞ্চাশবছর পরে শোষকের অত্যাচার হয়তো শারীরিক নেই কিন্তু কৃষকের উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত মূল্য না পাওয়া কিংবা মধ্যবর্তী ফড়ে, মহাজনেরা শোষণের নতুন মুখ রূপে আবির্ভূত হয়েছে ।

“গ্রামাঞ্চলে শ্রেণিসংগ্রামের মূল বিষয় হল জমির মালিকানার স্বত্ব । এই জমি ঘিরেই সংগ্রাম সশস্ত্র রূপ নেয় । এটাই নকশালবাড়ির পথ । চিনের পার্টিও একই কথা বলে, ‘আমরা

কৃষকদের বলেছিলাম জমি দখল করো এবং নিজেদের শক্তি দিয়ে বিপ্লবের ফলকে রক্ষা করো। এভাবেই আমাদের দেশে জনযুদ্ধ গড়ে উঠেছে' । এটাই নকশালবাড়ির বার্তা"।[৪১] 'আটটা নটার সূর্য' গল্পের কাঠামো এই ভাবনারই প্রতিফলন । ময়মনসিংহ গ্রামের জমিদার ভুবন মোদক প্রায় দেড় বছর গ্রামে অনুপস্থিত থাকার পর ফিরে এসে লক্ষ্য করেছে যে চরম আনুগত্য ক্ষেতমজুররা তাকে দেখাত, সেই আনুগত্যে ফাটল ধরেছে । তার ক্ষেতেই কাজ করতে যাওয়ার সময় মজুরের দল সেলাম ঠোকেনি, পাশ কাটিয়ে চলে গেছে । মজুর ফল্গুই এদের নেতৃত্ব দিচ্ছে, ভুবন তা উপলব্ধি করে । ফলে ছেলে হারাধনকে নিযুক্ত করে ফল্গুকে উপযুক্ত শায়েস্তা করার জন্য । হারাধনের দ্বারা শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়ে ফল্গুও একটি থান ইঁট তুলে হারাধনকে মারতে যায় । বোঝা যায় সহজে আর পদানত করা সম্ভব নয় এই মজুরদের। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াবশত ভুবন মোদক এই বিদ্রোহী মজুরদের খেতের কাজ থেকে বিতাড়িত করে এবং নোটিস জারি করে একমাসের মধ্যে তাদের সুদ আসল বাবদ সমস্ত ঋণ পরিশোধ করতে হবে না হলে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হবে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে । ফৌজদারি আইনেও আটক করা হতে পারে । চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে থানায় ফল্গুকে হাজিরা দেওয়ার হুকুম জারি করা হয় । গল্পের পরিণাম অবশ্য দীর্ঘকালীন শোষণের বিরুদ্ধে খতমের রাজনীতিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে । ভুবন মোদকের ছেলে হারাধনকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে শেষ করে দেয় ফল্গু ও তার দুই সঙ্গী । খতমের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সার্থকতা লাভ করল । কিন্তু বাস্তবে নকশালবাড়ি আন্দোলনের এই সিদ্ধান্ত ক্ষেত মজুরদের কতটা উন্নতি করেছে তা নির্ণীত নয় । তাই অসীম চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "চারুদার লাইন মোতাবেক ঘোষিত হল, 'শ্রেণিশত্রু খতম শ্রেণিসংগ্রামের উচ্চতর রূপ এবং গেরিলা যুদ্ধের সূচনা । শ্রেণিশত্রু খতমই একমাত্র পথ'। এই নিয়ে চিন পার্টির বক্তব্য হল, 'এটি ছোট ছোট দল নিয়ে গুপ্তহত্যা ছাড়া আর কিছু নয় । এভাবে জনযুদ্ধ হয় না'। জমির প্রশ্ন বাদ দিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধ সম্পর্কে চিন পার্টির বক্তব্য, এটি সরাসরি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লাইন – এভাবে জনযুদ্ধ গড়ে ওঠে না'। আমাদের অমার্জনীয় অপরাধ হল আমরা বিনা প্রতিবাদে সকলে এই লাইন মেনে

নিয়েছিলাম। পার্টি গঠনের সময় নকশালবাড়ির বার্তা, জমির স্বত্বে শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তোলার কর্তব্য অবহেলিত হল। শ্রেণিশত্রু খতম অভিযানের ভিত্তিতে পার্টি গঠিত হল”।[৪২]

হত্যার রাজনীতি পৃথিবীর কোনো আন্দোলনকেই সাফল্য এনে দিতে পারেনি। আর নকশালবাড়ির প্রকৃত বার্তাকে অবহেলা করার ফলস্বরূপ এই আন্দোলন তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারল না ।

১৯. গান্ডীব : সুযশ ভট্টাচার্য

সুদূর প্রসারিত সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারার আগ্রাসনে অভ্যস্থ শোষিত মানুষ নকশাল আন্দোলনের অভিঘাতে নতুন করে ভাবতে এবং বাঁচতে শেখার একটি অভিপ্রায় গ্রহণ করেছিল । বাস্তবে তা যে সার্বিকভাবে ফলপ্রসূ হয়েছিল এমনটা নয় । তবুও মনের গভীর গোপন কোণে কোথাও না কোথাও একটি আশা লুকিয়েছিল যে পরিবর্তন হবে । এই ভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছে সুযশ ভট্টাচার্যের ‘গান্ডীব’ গল্পে । এই গল্পে রজনী কপাট বসিরহাট অঞ্চলের একজন কৃষক । নকশাল আন্দোলনের সহযোগী হিসেবে সত্তর একাত্তর সালে সে বারাসতের জেলেও বন্দীও হয়েছিল । বাহাত্তর সালে ধান কাটাকে কেন্দ্র করে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে এবং মামলাও হয় । সেই মামলার জন্যই উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে সে যখন সন্ধ্যেবেলায় বাস থেকে নেমে বাড়ি ফিরে আসতে চাইছে, তখনই তার সাক্ষাৎ হয় মাতাল নুটু মল্লিকের সঙ্গে । নুটু মল্লিকই এই অঞ্চলের সর্বেসর্বা । সেই পুলিস, সেই নেতা, সেই পঞ্চায়েত। নকশাল আন্দোলনের সময় রজনী কপাটের দল নুটুদের নিয়ে যা খুশি করেছে । ‘জমি কেড়েছে , ধান কেটে নিয়েছে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে, আর পাঁঠা কাটার মতো কেটেছে নুটুর মতো লোকেদের । উঃ সে সব দিনের কথা চিন্তা করলেই নুটুর কলজে

ঠাণ্ডা হয়ে আসে। কিন্তু এখন আবার নুটুদের দিন। নুটু যদি বলে পশ্চিমে সূর্য ওঠে তাহলে এ তল্লাটে যত হাড় হাভাতে ছোটোলোক একবাক্যে বলবে, হ্যাঁ পশ্চিমেই সূর্য ওঠে।'[৪৩]

কিন্তু ১৯৭২ সালের পর থেকে এখন নুটুদের শাসন আবার ফিরে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের অধিকারের দাবি বজায় রাখার জন্য সবাইকেই শাসনে রাখতে হয়। ভয়ের রাজনীতি করতে না পারলে এই ছোটলোকেদের শায়েস্তা করা সম্ভব নয় । তাই চোখ রাঙিয়ে রজনীকে সে শাসিয়ে রাখে এই বলে –'পাটি ফাটি করলে এবার হাটের ওপর মেরে ঝুলিয়ে দেব তোদের মাগ ভাতারকে'।[৪৪] নকশাল পার্টি রজনী কপাট, জেলে যাওয়া রজনী কপাট ঘরে ফিরে আসে। আবার নতুন করে পার্টির কাগজ বের করে পড়তে বসে । 'রক্তে ঘামে ভেজা' এই পার্টি । এ একেবারে মনের কথা বলে । এর জন্য সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে । তাই বউকে সে প্রশ্ন করে – তার জেলে যাওয়ার আগে যে বড়ো চাকুটা ছিল সেটা এখন কোথায় ? খড়ের চালে লুকোনো আছে জেনে সে নিশ্চিন্ত হয় । কারণ 'পাটি যে অস্তর নামায় না কখনও ! মোদের কি চাকু হারালে চলে ?'[৪৫] অতীতের মায়ায় এই সাহসী প্রত্যয়টিই থেকে যায় , ভবিষ্যতের আসন্ন সংগ্রামের জন্য ।

২০. ডাইন : অমর মিত্র

বিচিত্র মানুষ , বিচিত্র জীবন কথার সম্ভার নিয়েই সাহিত্য বারবার আমাদের চমকিত করে, স্তম্ভিত করে। অমর মিত্রের ' ডাইন' সেই ধারারই একটি দৃষ্টান্ত। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ছোটোগল্প আমাদের আলোচনার বিষয় । মানুষের জন্য মানুষেরই এই আন্দোলন। প্রত্যক্ষ সংঘাতের সঙ্গে সংযুক্ত না থেকেও আন্দোলনের সহযোগী হয়ে ওঠে এমন অনেক মানুষ যাদের অবদান প্রত্যক্ষ সংগ্রামকারীদের থেকে কোনো অংশেই কম নয় ।তাই অমর মিত্রের 'ডাইন' গল্পটি যতটা হরি নায়েকের ততটাই তার স্ত্রীর ও গল্প । ১৯৭০ -৭১ সালে

নকশাল হয়ে যাওয়া মেদিনীপুর জেলার গোপীনাথপুর থানার কীর্তনিয়াশোল মৌজার বাসিন্দা হরি নায়েকের ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপত। লোকের বিশ্বাস ছিল– ‘শ্রী হরি ভগবান। ভগবান এই কারণে যে, আমাদের বিশ্বাস ভগবানই দণ্ডমুন্ডের কর্তা। মানুষের জীবন – মৃত্যু তাঁর ইচ্ছা। একদিন হরি নায়েক মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করত। হরি নায়েক মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত করে দিত। একেবারে চিত্রগুপ্তের খাতা নিয়ে বসেছিল সে। পৃথিবীতে মানুষের পাপ – পুণ্যের হিসেব করত। মানুষে ছড়া বেধেছিল – রাখে হরি মারে কে? মারে হরি রাখে কে ?’[৪৬]

বেনামে জমি রাখার কৌশলকে দমন করার জন্য এলাকার গরিব মানুষদের নিয়ে সে দল তৈরি করে। জমিদার–জোতদার–মহাজন ও সুদখোরদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করে সুদখোর– মহাজনদের সুদ নেওয়ার প্রথাকে বন্ধ করতে চায়। কিন্তু প্রশাসন তো সবসময়ই ক্ষমতাশালীদের হাতে। স্বাভাবিক ভাবেই ঊনিশশো একাত্তর সালে হরি নায়েক গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু নায়েক জেলে বন্দী হওয়ার আগে পুলিস অফিসার শতপথী মহাপাত্রের তিনটি গুলি তার গায়ে লেগেছিল। সেই তিনটি গুলি নিয়ে সে চারদিন জঙ্গলে লুকিয়েছিল। কাঁধের ভিতর বুলেট নিয়েও সে জীবিত আছে। সুতরাং সে তো সাধারণ মানুষ হতে পারে না। ফলে নায়েক জেলে গেলেও মানুষকে যে চেতনার দ্বারা সে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সেই চেতনার অবসান হয় না। গ্রামের মানুষ সংগঠিত হয়ে অন্তরে অন্তরে বিদ্রোহের আগুনকে জ্বালিয়ে রাখে। নায়েকের অনুপস্থিতিতে ধীরে ধীরে আবার অত্যাচার শুরু হয়। তাদের বক্তব্য ছিল – ‘ভূমির নয়, আসলে কৃষি সংস্কার চাই। গরিব হাড় – হাভাতেরা যেসব জমি দখল করে কর্ষণ করে, তা নিয়ে নাও। গরিব মানুষের না আছে অর্থের সংস্থান না আছে শিক্ষার আলো। তাদের দ্বারা জমি অপমানিত হয়। সুতরাং বাবুরা বেনাম জমির দখলে চলে গেলেন। আবার সুদের হার বৃদ্ধি করলেন’।[৪৭] তারা নিশ্চিন্ত ছিলেন হরি নায়েক আর ফিরবে না। কিন্তু সমস্ত ভাবনা মিথ্যা প্রমাণ করে নায়েক পুনরায় উপস্থিত হয়। তার কোনো পরিবর্তন হয়নি বরং আরো বেশি তার ঔদ্ধত্য বেড়েছে। তারা যমের মত ভয় করতে শুরু করেছে, আর কোথাও বা মনের

কোণে এই সংস্কার দানা বেঁধেছে নায়েকের মৃত্যু হতে পারে না । তিনটি বুলেট আর টাঙ্গির কোপ খেয়েও যে গ্রামে বিচার সভা বসাতে পারে, সে নিশ্চয়ই মানুষ নয় । তার মধ্যে পিশাচশক্তি আছে ।

হরি নায়েক পুনরায় আন্দোলন চালাতে শুরু করে । তার নেতৃত্বে পাঁচশো মানুশ মিছিল করে উপস্থিত হয় সুদখোর দাতারামের বাড়িতে । দাতারাম ও প্রতিরোধ করে । দাতারাম তীরে বিধ্বস্ত হয়ে মারা যায়। কিন্তু মরার আগে গুলিতে নিহত করে নায়েককে । বেশিরভাগ মানুষের কাছেই তা অজানা থেকে যায় । সবাইভাবে খুনের মামলার ভয়ে নায়েক পালিয়েছে । গভীর রাতে নায়েকের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে আসে তার চার সঙ্গী কীর্তনিয়াশোলে । নদীর চরে লাশ নামিয়ে তারা ভাবতে থাকে কি করা উচিৎ। কারণ যদি জানা যায় নায়েক মরেছে , তাহলে শতপথীর মতো শয়তানেরা ছিঁড়ে খাবে সাধারণ গরিব মানুষগুলোকে । তাই নায়েকের মৃত্যু শুধু নায়েকের মৃত্যু নয় এই গ্রামগুলোর সব সাধারণ মানুষের মৃত্যু। এই চরম সংকটে নায়েকের বউ এক অন্য প্রতিরোধের কৌশলকে গ্রহণ করতে বলে। ফিসফিস করে সে নায়েকের সঙ্গীদের পরামর্শ দেয় – ‘লাশ পুঁতে ফেল , রটাই দে নায়েক পলাইছে, মু সিঁদুর পরি । ... শাখা সিঁদুর পরা থাকলি নায়েক মানুষের ভিতর বাঁচি থাকে, বাবুগণ ভয় পায় , তদ্দিন আর এক নায়েকের জন্ম হবে’।[৪৮] নায়েকের লাশ পুঁতে ফেলা হয় সুবর্ণরেখার চরে । এরপর থেকেই নায়েকের বউ লালপেড়ে শাড়ি , আলতা আর সিঁদুরে নববধূ সেজে নদীর চরে প্রদীপ জ্বালাচ্ছে। আর লোক ভাবছে নায়েকের বউয়ের চরিত্র খারাপ হয়ে যাচ্ছে । ডাইন হয়ে উঠছে । ক্ষমতাশালীদের মনে উদয় হয় এই প্রশ্ন নায়েকের মতো মহৎ মানুষের বউয়ের এমন অবস্থা হয় । স্বামী নিখোঁজ অথচ স্ত্রীর সাজের ঘটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই যাচ্ছে । হরি নায়েকের বউয়ের এই ডাইন হয়ে ওঠার আড়ালে আসলে তো এক অন্য প্রতিরোধের গল্পই শাশ্বত হয়ে ওঠে ।

২১. স্বস্ত্যয়ন : স্বপ্নময় চক্রবর্তী

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দীর্ঘ প্রোথিত শিকড়কে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে নকশাল আন্দোলনের যে লড়াই তা নানা স্বরূপে বাংলা ছোটগল্পে উপস্থাপিত হয়েছে । গ্রামের ভূমিহীন খেতমজুর , প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের উপর ক্ষমতাবান জোতদার ও মহাজনদের শোষণের ইতিবৃত্ত নানা স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী – র ‘স্বস্ত্যয়ন’ গল্পটি এই বিষয়টিকেই অবলম্বন করে রচিত । গল্পের প্রয়োগগত উপস্থাপনা এবং মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের অভিঘাতে একটি অভিনব শিল্প সমন্বিত গল্প হিসাবেই নকশাল আন্দোলন সম্পর্কিত গল্পের শ্রেণিতে একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে ।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রতিকান্ত জোতদারী শোষণের পাশাপাশি মহাজনী কারবার করেও ফুলে ফেঁপে উঠেছে । বিয়ের প্রায় কুড়ি বছর পর বহু চিকিৎসা ও অর্থব্যয়ের পরে তাদের প্রথম সন্তান আসন্ন। সেই কারণেই স্বস্ত্যয়নের জন্য গুরুদেবের আগমন ঘটেছে । স্বস্ত্যয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণই সংগৃহীত হয়েছে । প্রয়োজন শুধু ‘স্বোপার্জিত জমির তিনহাত গভীরের এক খাবলা মৃত্তিকা’[৪৯] এটি সংগ্রহ করবেন স্বয়ং গুরুদেব । রতিকান্তের চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সবকিছুতেই একটু অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো করা। গুরুদেব তাকে সাবধান বাণী শুনিয়েছেন– ‘তাড়াহুড়োর জানবি মরণ, ধর্ম হল ধৈর্য ধারণ’। রাত্রিবেলা শুয়ে গুরুদেবের এই বানীগুলো স্মরণ করতে গিয়েই বায়োস্কোপের মতো পুরোনো ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে । লেখক দেখাতে চান রতিকান্তের পুরোনো স্মৃতি চলচ্চিত্রের দৃশ্য সঞ্চালনের মতো পরপর তার চোখের সামনে ভেসে আসে । যে রেকাবিটা আজ সে গুরুদেবকে ডান করেছে তা আসলে নিশিচরণের । নিশিচরণের ছেলেকে সাপে কাটার পর ওই রেকাবি বন্ধক রেখে রতিকান্ত পাঁচটাকা নিশিচরণকে দিয়েছিল । দেড়বছর পরে যখন নিশিচরণ পাঁচটাকা দিয়ে থালাটা ফেরৎ নিতে এল, ততদিনে সুদে আসলে দাঁড়িয়েছে বারোটাকা । সেই টাকা আর কোনোদিনই নিশিচরণের পক্ষে ফেরৎ দেওয়া সম্ভব

হয়নি । রতিকান্ত যেন দেখছে, নিশিচরণ তার মশারির পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে থালাটাও যাচ্ছে । এইভাবে রতিকান্ত সারারাত ধরে তার সমস্ত অপকর্মের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে । ভোরবেলা উঠে সে উপলব্ধি করেছে সারারাত ধরে সে দুঃস্বপ্ন দেখেছে । আজও স্বস্ত্যয়নের জন্য প্রয়োজন স্বোপার্জিত জমির মৃত্তিকা । গ্রামের সাধন মাস্টার তাকে বলেছিল কোনো জমিই রতিকান্তের নয় । অন্যায় ভাবে রতিকান্ত অন্যের জমি ভোগ করে । কালরাতের দুঃস্বপ্নে সাধন মাস্টারও এসেছিল । ফলে রতিকান্তর মনটা ভালো ঠেকে না । সে তার স্বোপার্জিত জমি কোনটা ভাবতে বসে । দেখে সব জমিই কোনো না কোনো ভাবে দখল করা হয়েছে । শেষপর্যন্ত তার মনে হয় বলনা মৌজার জাম গাছতলার ডাঙা জমিটাই তার একমাত্র স্বোপার্জিত জমি । এই জমিটিই একমাত্র সে ধান বেচার টাকায় কিনেছিল । ওই জমির মাটি নেওয়ার জন্য রওনা হয় লোক লস্কর, চাকর বাকর, গুরুদেব, রতিকান্ত, আর বাপ মা মরা রতিকান্তর ভ্রাতুষ্পুত্র । জাম গাছতলা খোঁড়াখুঁড়ি করে পাওয়া যায় বোমা । সাধন মাস্টার যে আন্দোলন শুরু করেছিল তারই হাতিয়ার হিসেবে সঞ্চিত হয়েছিল এই বোমাগুলি । রতিকান্ত ওই স্থানটি বাদ দিয়ে অন্যত্র খুঁজতে বলে । আর সেইখান থেকেই মাটি খোঁড়ার একটু পরেই পাওয়া যায় সবুজ জামা পরা নরকঙ্কাল । রতিকান্ত বুঝতে পারে কঙ্কালটি সাধন মাস্টারের । হরকান্তের মেজোছেলেকে একহাজার টাকা দিয়েছিল রতিকান্ত – 'ও বলেছিল সাধন মাস্টারের লাশ ফেলে দিয়েছে কুনো নদীর বানের জলে । ধোঁকা দিল ?

'রতিকান্ত চোখ মেলে – কুনো নদীর বান ওইখানে কঙ্কাল হয়ে পড়ে আছে । ... রতিকান্ত চিৎকার করে – গর্ত বোজা, এখুনি, এখুনি । নিচু হয়ে তুলে নেয় এক খাবলা মাটি, সবুজ জামার উপর ছুঁড়ে দেয়, সবুজ জামা নড়ে ওঠে আর ওমনি নড়ে ওঠে জয়া-রত্না আই আর এইটের এর মাঠ। দুহাতে খাবলা খাবলা মাটি তোলে, ছুঁড়ে দেয় সবুজ জামায় , সবুজ জামাটা আড়াল করা দরকার। অসহ্য ।

'কিন্তু চতুর্দিকের সমস্ত মাঠ জুড়ে ছড়ানো সবুজে , রতিকান্ত দেখে সাধন মাস্টার শুয়ে আছে। পরণে সবুজ জামা' ।[৫০]

স্বার্থপূরণের তাগিদে , সমস্ত প্রতিরোধকে স্তব্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে সাধন মাস্টারকে হত্যা করেছিল রতিকান্ত । কিন্তু সেই হত্যার অভিঘাত আজ তার চেতন ও মননকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যা থেকে মুক্তি পাওয়া আজ অসম্ভব হয়ে পড়েছে ।

২২. মৃত্যুহীন : সনৎ বসু

কৃষক সমাজের কাছে তাদের ন্যায্য দাবী ও আত্মমর্যাদার প্রশ্নকে সামনে এনে দিয়েছিল নকশালবাড়ি আন্দোলন। আমাদের সামাজিক– অর্থনৈতিক ইতিহাসে অবহেলিত আদিবাসী কৃষক – শ্রমিক সমাজকে শ্রেণিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য হাজার হাজার ছাত্র – যুবক তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নকে ছেড়ে এসেছিলেন এই সংগ্রামের অংশীদার হতে । আমাদের আলোচ্য 'মৃত্যুহীন' গল্পের বুধু মাস্টার ওরফে বুদ্ধদেব পার্টির ডাকে সাড়া দিয়ে কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে আসানসোলের কোলিয়ারি এলাকায় কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কোলিয়ারি থেকে এখন তিনি উপস্থিত হয়েছেন ডিঙাপাড়ায় ফসল রক্ষার আন্দোলনে । ডিঙাপাড়া সহ আর দশটা গাঁয়ের ধান জোতদার মাধো সিংয়ের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে বুধু মাস্টারের নেতৃত্বে সুখন, রঘুয়া, বাবুলাল, কাল্লু , শিবু সবাই জোট বেঁধেছে। "জান দিব । ধান না' ডিঙাপাড়ার মরদরা এবার মাধো সিংকে বুঝিয়ে দেবে কলিজার জোর কার বেশি"[৫১] মাধো সিং প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে । ক্ষমতার দম্ভে সুখনদের সহযোগী মঙ্গলাকে খুন করে । এই হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার সময় উপস্থিত হয় । মাধো সিং ও বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে প্রস্তুত হয়ে ওঠে । পরিকল্পনা করা হয় দশটা গ্রামে একই সঙ্গে ধান কাটা হবে । ফলে কোনো জোতদার কারোর সাহায্য করতে পারবে না। পরিকল্পনা

মাফিক ধান কাটা চলতে থাকে । কিন্তু মাধো সিং – এর পোষা গুন্ডারাও বন্দুক হাতে ছুটে আসে । গুলিতে নিহত হয় বুধু মাস্টার । কিন্তু ধানকাটার লড়াই থামে না । মাস্টার বলেছিল লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই সর্দার তৈরি হয় । কিন্তু লড়াইয়ের শুরুতেই নেতা চলে গেল । তবে কি সংগ্রাম থেমে যাবে ? কিন্তু সংগ্রাম তো থেমে থাকে না । তাই কয়েক ঘন্টার ব্যবধানেই সুখন অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেল। 'এতদিন সে ছিল এক গাঁয়ের সরদার । এখন তাকে দশ গাঁয়ের নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে । লড়াইকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে । বুধু মাস্টারের মৃত্যুকে কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেবে না সুখন'।[৫২] কাল থেকে কালান্তরে এইভাবেই লড়াইটা প্রবাহিত হয় । কারণ সংগ্রাম 'মৃত্যুহীন'।

২৩. মোকাবিলা : বশীর আল্‌হেলাল

নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গল্পগুলির মধ্যে লেখকের ব্যক্তিগত আবেগের প্রাবল্য এবং এই আন্দোলনের প্রতি একান্ত সমর্থন অধিকাংশ গল্পেরই মূল ভরকেন্দ্র বলা যেতে পারে । তাই স্বপ্নপূরণের তাগিদটাই গল্পগুলিতে প্রধানতম বিষয়রূপে উপস্থাপিত হয়েছে । অন্যায়-অত্যাচার-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তরুণ লেখক প্রজন্ম নকশাল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই মানসিকতারই প্রকাশ এই সময়ের বহু গল্পের মূল আবহ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে । তীব্র রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকেও গল্পগুলিতে সমস্যা সমাধানের জন্য বাহ্যিক সমাধান সূত্র আরোপিত হয়েছে । দীর্ঘকালীন ধরে প্রচলিত সামাজিক-রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক অসাম্যের সমাধান যে শুধুমাত্র প্রবল রাজনৈতিক বিশ্বাস বা আবেগের দ্বারা সম্ভব নয় সে সত্য অনেক স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতাশালীদের দ্বারা নিগৃহীত, লাঞ্ছিত হবার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবং এই দীর্ঘযাপিত যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য লড়াইয়ের স্বপ্নও আছে । সন্তানসম্ভবা সুখিয়া – কে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে মেরে , তার স্বামী ভাগিরথীকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ । সেই খবর পৌঁছানোর দায়িত্ব নিয়েছে 'কমরেড' – রা ।

এই অঞ্চলের প্রধান জোতদার রামরতন তিরকি – র বাড়িতে মোষের দেখাশোনা করে বোবা – কালা দাসু । আর বোবা কালা বলেই রামরতনের বাড়িতে তার কাজটা এখনো রয়েছে । আর সবাইকে ছাঁটাই করে দিয়েছে রামরতন । ‘তিনহাজার সাঁওতাল, মুন্ডা আর রাজবংশী যেদিন তার বাড়ি ঘেরাও করে তার পর্বত প্রমাণ ধান – পান লুঠ করে নিয়ে গেল , তারপরই সে তার খেতখামারের লোকগুলোকে ছাড়িয়ে দিয়েছে । কারণ তারাও সেই লুটের মধ্যে ছিল। এখন তার বাড়িতে পুলিশের চব্বিশ ঘন্টা পাহারা। আর তার যে জমিগুলো এখনো লালপার্টির লোকের হাতে পড়েনি সেগুলো উত্তরপ্রদেশ থেকে লোক আনিয়ে সে চাষ করেছে’।

ভাগিরথীর বাড়িতে যখন পুলিশ ঢুকেছিল তখন দাসুই গলার শিরা ফুলিয়ে আঁ আঁ করে গোঙাতে শুরু করেছিল । মোষগুলোও দাসুকে দেখে একই রকম চিৎকার করেছিল । এই চিৎকারেই সবাই সাবধান হয়ে গিয়েছিল । দাসু – র প্রতিদিনের সকালের কাজ হল পুলিশের বাড়িতে মোষের দুধ দিয়ে আসা । পরের দিন পুলিশের ঘরে দুধ না পৌঁছতে দাসুর খোঁজ পড়ে। দেখা গেল খোঁয়াড়ের শ্রেষ্ঠ মোষ আর দাসু নেই । খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল ভাগীরথীর উঠোনে । সুখিয়ার জন্য মোষের দুধ দুইছে দাসু । রামরতন শেষপর্যন্ত তার সবচেয়ে গোপন এবং মারাত্মক শত্রুটিকে ধরতে পারল । দুধের সান্‌কি দাসুর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পুলিশ ছুঁড়ে মারল দাসুর মুখে । মুহূর্তে দুধের রঙ পাল্টে হল লাল । রামরতন যখন খোয়ারে ফেরৎ এল সমস্ত মোষগুলো ঘোলাটে চোখ পাকিয়ে ফোঁস করছে । রামরতনের মনে হচ্ছে এরাও সব তার শত্রু । আর ‘তখন সেই জঙ্গলের ঘরে ঘরে , ঝোপের আড়ালে আড়ালে অসংখ্য ছায়া তিরে ফলায় শান দিচ্ছে । কতকগুলো দাসুর মতন ছেলে একটা সুপারি গাছে তির ছুঁড়ে লক্ষ্য ঠিক করছে । সামনে আবার ফসল তোলার লড়াই কি না !’ [৫৪]

এই গল্পে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে নকশাল আন্দোলনের প্রতি লেখকের সমর্থন প্রবল । ফলত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে মুক্তির দশক আসন্ন এই স্বপ্নপূরণের তাগিদেই এই গল্পটি রচিত হয়েছে । বাস্তবে যদিও তা সম্ভব হয়নি ।

২৪. পূর্বদিগন্ত : সুখেন মুখোপাধ্যায়

কৃষক সভার নেতৃত্ব ছিল মূলত ধনী ও মধ্য কৃষক শ্রেণির হাতে । স্বাভাবিকভাবেই কৃষক সভা এই দুই শ্রেণির স্বার্থরক্ষার কাজেই আত্মনিয়োগ করত । খেতমজুর কিংবা ভূমিহীন কৃষকদের অধিকারের দাবিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হত না । 'দেশব্রতী' পত্রিকায় (১৩৭৫ বঙ্গাব্দে) চারু মজুমদারের বক্তব্য ছিল ' শ্রমিক ও কৃষক পার্টি সভ্য থাকা সত্ত্বেও পার্টি মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পার্টিতে পর্যবসিত হয়েছিল । তারই ফলে পার্টি একটি খাঁটি সংশোধনবাদী পার্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে । একটি সংশোধনবাদী পার্টির মতোই আমাদের পার্টিও একটি নির্বাচন থেকে আর একটি নির্বাচন পর্যন্ত যেসব আন্দোলন পরিচালনা করত তার লক্ষ্য থাকত পরবর্তী নির্বাচনে বেশি আসন দখল । পার্টির প্রধানকেন্দ্রগুলি ছিল শহরে এবং শহরে আন্দোলন সৃষ্টি করাই পার্টির প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল । এমনকি গ্রামের কৃষককেও শহরে আনা হোত শহরের আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য' ।[৫৫]

পার্টির নীতি এবং আদর্শ যতই তত্ত্বগতভাবে সার্বিক জনগণের মুক্তির কথা বলুক না কেন মূল উদ্দেশ্য হয়ে উঠল নির্বাচনে আসন দখল করার লড়াই । এই গল্পের সীতেশ পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে নির্বাচনে পার্টির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে । গ্রামের খেতমজুর সরতুল্লা সেখেদের সে বোঝায় কংগ্রেসের বদলে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেওয়ার কথা । কারণ কংগ্রেস কখনই খেতমজুরদের সমস্যার সমাধানে যত্নবান ছিল না । তাই অনাহারক্লিষ্ট , দারিদ্র্যগ্রস্ত খেতমজুররা যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনতে চায় তাদের স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে । কিন্তু বাস্তব বড়ো নির্মম । যুক্তফ্রন্টের মূলস্বরূপ কিছুদিনের মধ্যেই উন্মোচিত হয় । সরকারি পতিত জমি দখলের বিরুদ্ধে পুলিসি প্রশাসন কৃষকদের উপর নির্মম অত্যাচার চালায় । যুক্তফ্রন্ট সরকার তার কার্যকালের মেয়াদ শেষ করতে পারে না । জরুরী অবস্থার শেষে আবার নির্বাচনের ডঙ্কা বাজে । সীতেশের আত্মোপলব্ধি হয় ভুলের খেসারত দিতে হয় । কারণ 'সংশোধনবাদী' রাজনীতি শুধুমাত্র নির্বাচনের আসন দখলকেই পাখির চোখ করেছে । বীতশ্রদ্ধ

হয়ে এই রাজনীতির বিরুদ্ধে গিয়ে সে নকশালদের কার্যক্রমেই আস্থাপোষণ করে । তার মনে এই প্রতীতিই ভাস্বর হয়ে ওঠে এই বারুদের গন্ধভরা কৃষক বিপ্লব ছাড়া মুক্তির আর কোনো বিকল্প পথ নেই ।

২৫. আবার উজান : নির্মল চন্দ

জমিদারী প্রথা অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরও গ্রামবাংলায় জোতদাররা কিংবা মহাজনেরা দরিদ্র কৃষকদের উপর তাদের অন্যায় অত্যাচারকে স্তব্ধ করে দেয়নি । জমিদারের খুনে বাহিনীরা সদা সক্রিয় থেকে গ্রামীন প্রজাদের উপর নির্মম অত্যাচার করে এসেছে । 'আবার উজান' গল্পের গরিব কৃষক নারানের গল্পটি তাই অসাধারণ কিছু নয় । খরা, অজন্মা ইত্যাদি কারণে সে তার সাত বিঘে জমিকে ধীরে ধীরে জোতদার সুজন মহাজনের কাছে বন্ধক দিতে বাধ্য হয়েছে । ফলে জমির মালিক নারান আজ ভাগচাষিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে । ভাগচাষির ন্যায্য দাবি হিসাবে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তার প্রাপ্য । কিন্তু সুদ হিসাবে ফসলের সমস্ত ভাগটুকুই আত্মসাৎ করে নেয় সুজন মহাজন । তাই শুধু ফসল নয় গরিব কৃষকের মেয়ের ইজ্জৎ চলে গেলেও তার প্রতিবাদ করা যায় না । পুলিস ও প্রশাসনের সহযোগিতায় অন্যায়কারীরা সহজেই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায় । তবে সময় তো একরকম থাকে না । গণসংগ্রামের জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হতে থাকে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া সাধারণ মানুষ । সশস্ত্র আক্রমণের মাধ্যমেই প্রতিরোধের আগুন জ্বলে ওঠে। বাদল শেখ, নারান এবং আরো কয়েকজন মিলে সুজন মহাজনের বাড়ি আক্রমণ করে । বাদলের হাতে সুজন খুন হয়ে যায় । সুজনের লাঠিয়ালরা নারানের পাটা খোঁড়া করে দেয় । বাদল পালিয়ে যায় । নারান ছয়মাস জেল খেটে গ্রামে ফিরে আসে । ভাইপো মিহিরের সঙ্গে থাকতে শুরু করে। মহাজন সুরেন মণ্ডলের বাড়িতে পেটভাতা আর বাৎসরিক কুড়ি টাকার বিনিময়ে রাখাল হিসেবে মিহির কাজ করে । এছাড়া দৈনিক পাঁচ টাকার বন্দোবস্তে একটা বিলে মাছ ধরার

কাজ শুরু করে নারান এবং মিহির । প্রতিদিন পাঁচটাকা দেওয়ার পর যা থাকে তাই দিয়েই চলে কাকা-ভাইপোর। শোষণের ইতিহাসের নিবৃত্তি ঘটেনা। ফলে আবার সূত্রপাত হয় নতুন আন্দোলনের। এর মধ্যে খুন হয়ে যায় সুধীর মহাজন। গরীব চাষী নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে জমির, ফসলের শোষণহীণ সমাজের। রাতে পুলিস আসে নারানের ঘরে । নারানকে মারে কিন্তু মিহির আগেই পালিয়ে যায়। নারান উপলব্ধি করে এই হত্যার চক্রান্তে মিহিরের একটি ভূমিকা আছে। পুলিস চলে যাওয়ার পর গ্রামের হত দরিদ্র কৃষকেরা এগিয়ে আসে । নারানকে সোজা করে দাঁড় করাতে চায়। খোঁড়া পায়ের কথা ভুলে সবার হাত ধরে নারান সঙ্ঘবদ্ধ লড়াইয়ের আদর্শকে আরো একবার নতুন করে নিজের জীবনে উপলব্ধি করে। মানসিক প্রস্তুতি শুরু হয় নতুন একটি লড়াইয়ের। কারণ লড়াইতো একটি অনিঃশেষ প্রক্রিয়া।

২৬. মৌজা ডোমপাটি : রামকুমার মুখোপাধ্যায়

অতিক্রান্ত সময়ের অভিঘাতকে ধীরে ধীরে স্তিমিত হতেই হয় । রামকুমার মুখোপাধ্যায় এই বাস্তব সত্যকেই তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ‘মৌজা ডোমপাটি’ গল্পে । ঐতিহাসিকভাবে এটা সত্য যে নকশাল আন্দোলন একটি ব্যর্থ আন্দোলন । এই সংগ্রাম যে দাবি এবং অধিকারের লড়াই করেছিল তা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেনি । নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অনেক গল্পেরই মূল অভিমুখ নির্ধারিত হয়েছে ব্যর্থতার মধ্যেও নতুন কোনো স্বপ্নের মন্ত্রবলে নতুন করে উত্তরণের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ এই আন্দোলনের ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নিয়েও ভবিষ্যতের মুক্তির স্বপ্ন হিসাবে আবার নকশাল আন্দোলনেই যে সামিল হতে হবে সেই প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে । সেইদিক থেকে এই গল্পটি একটি ব্যতিক্রমী গল্প । এখানে স্বপ্নের জগত থেকে বাস্তবের নিষ্ঠুর মাটিতেই গল্পকার শেষপর্যন্ত বিনোদ ডোমকে নিয়ে এসেছেন ।

জামকুঁড়ির মোহন্তদের পাঁচ বিঘে জমি চাষ করত বিনোদ ডোম । সে একসময় শুনেছিল জামকুঁড়ির মল্লরাজ তার কোনো এক পূর্বপুরুষকে অনেক জমি দিয়েছিলেন । সে সব জমি অবশ্য হস্তান্তরিত হয়ে যায় পরে । বিনোদ শুধু জমির গল্পই শুনেছিল । সে যখন জমি চাষ করতে শুরু করে তখন সব জমিই রাজপরিবারের পূজারি মোহন্তদের দখলে চলে গিয়েছিল । বাংলার তিয়াত্তর সাল থেকে যখন জমির লড়াই শুরু হল, লাঙল যার জমি তার স্লোগান উঠতেই জমি থেকে উৎখাত হয়ে যায় বিনোদ । লড়াই করার ক্ষমতাও তার ছিল না। মোহন্তদের বন্দুকের নলের সামনে প্রতিবাদ করার শক্তি ও সে পায়নি । আর আন্দোলনের নেতারা হয় তখন জেলে নয় ,পুলিসের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। একমাত্র জেলের বাইরে ছিল হাই – ইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার কার্তিক বাড়ুঁজ্যে । তিনিও তিনখানা পুলিসকেসে অভিযুক্ত বিনোদ ডোমকে সাহায্য করতে রাজি হননি । রাতারাতি পালিয়ে যেতে হয়েছিল বিনোদকে । পুলিস কিংবা গ্রামের লোক কেউই আর তার খোঁজ করেনি । গ্রামের লোকের উপর অভিমানে সেও আর ফিরে আসেনি । আর ফিরে যাওয়ার মতো কিছু ফেলেও সে আসেনি । কারণ কার্তিক বাড়ুঁজ্যের কাছ থেকে সাহায্য না পেয়ে ফেরার পথে মোহন্তদের লোকজন বিনোদকে তুলে নিয়ে যায় । আর তার গোরু, ছাগল, কুড়েঁঘর বাবদ তিনহাজার টাকা দিয়ে সাদা কাগজে সই করিয়ে নিয়ে এই তল্লাটে আর কোনোদিন না ফেরার প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নেয় । এরপর জীবনের ছাব্বিশ – সাতাশটা বছর কেটে গেছে । নিজের অতীত কিংবা বর্তমান কোন কিছু নিয়েই আর শোক সে করে না । হাতে লাঙল আর মুখে বাঁশি নিয়ে জীবনের শেষ কটাদিন কাটিয়ে দিতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত হয় । কিন্তু হঠাৎ করেই ডাননের মেলায় গিয়ে দেখা হয় বালসীর ভবদার সঙ্গে । ভবদা অবাক হয়ে যায় । কারণ সে শুনেছিল জামকুঁড়ির বিনোদ ডোম দেশান্তর হয়ে গেছে আবার কারোর কাছে শুনেছিল মানুষটা পার্টি করতে গিয়ে মরে গেছে । বহুকালের বন্ধুত্ব দুজনের, ভবদাই বিনোদকে বলে তার জমি এখনো রয়ে গেছে । সে গেলেই জমি পাবে । মদের নেশায় যে কাল্পনিক গল্প ভবদা শুনেছিল তাই বিনোদকে শোনায় । ভবদার বালসী থেকে ডোমপাটি

অনেকটাই দূর । তারপক্ষে জানা সম্ভব নয় বিনোদের জমির কথা । "কিন্তু যার বন্দুকের গুলিতে বর্ধমানের মোহন্ত মরে , জামকুঁড়ির মোহন্তরা রাজত্ব ছেড়ে পালায় , তার জমি হস্তান্তর হওয়া উচিৎ নয় । তার ঔচিত্যবোধ থেকে ভবদা বলে 'সে জমি পড়ে আছে, চলে যা, তোকে দিয়ে দেবে"।[৫৬] এখনকার পার্টির নেতারা নিশ্চয়ই নকশাল বিনোদ ডোমকে তার জমি ফিরিয়ে দেবে। বিনোদও মদের নেশায় বিশ্বাস করতে থাকে এই সম্ভাবনার। ভবদার মুখে শোনা তার বড় মোহান্তকে মারার গল্পকেও সত্যি বলে মনে করতে ইচ্ছা করে । বাঁশিটাকেই সে কাল্পনিক বন্দুক বানাতে চায় । মাতাল বিনোদ হাঁটতে থাকে জামকুঁড়ির পথে। শেষপর্যন্ত রাত যখন শেষ হয় , 'শরীরে নেশার টান আলগা হয়ে আসে । বিনোদ বোঝে জামকুঁড়ি যাওয়া অর্থহীন । ছাব্বিশ – সাতাশ সাল পরে কে চিনবে তাকে ? চিনেই - বা কী হবে !'[৫৭] পক্ষপাতহীন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে গেলে এটা অনস্বীকার্য , গণসংগ্রামের পথ ধরে জমির উপর সম্পূর্ণ অধিকারের যে দাবি করা হয়েছিল তা থেকে বিচ্যুতি ঘটে গিয়েছিল । শোষণের ইতিহাস এখনো একইরকম ভাবে সক্রিয় । বিনোদ ডোমেদের জমির মালিক হওয়ার স্বপ্ন তাই আজও অধরাই থেকে গেছে ।

২৭. ভবতারণের গল্প : নিমাই ঘোষ

জেলে থাকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ভাবনা থেকে গড়ে ওঠা 'নিমাই ঘোষ' এর 'ভবতারণের গল্প' শৈল্পিক মানদন্ডে কতটা সার্থক হয়ে উঠেছে তা নিয়ে তর্ক হতেই পারে । কিন্তু জেলজীবনের অনুভূতিজাত এই গল্পে হৃদয়ের উত্তাপ স্পষ্ট । ক্ষুদ্র কৃষক ভবতারণ শ্রেণিগত মানদন্ডে ছোটলোক শ্রেণিতে পড়ে। এই পার্টিতে আসার পিছনে একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। সব্জি বিক্রি করতে গিয়ে ট্রেনে আলাপ হয় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে । লোকটির কথায় সে মন্ত্রমুগ্ধ হয় । 'রাজনীতির সাথে ভবতারণের কোনদিনই কোন যোগ ছিলো না । ও কংগ্রেস পার্টির কথা জানতো আর লাল ঝান্ডার কথা , শহরে মিছিল দেখেছে । ওদের গাঁয়ের

অনেক লোককে সেই মিছিলে যেতে দেখেছে আর ট্রেনে যাতায়াতের পথে অনেককে আলোচনা করতে শুনেছে । কিন্তু নিজে কখনও জড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু ওই মানুষটা তাকে সেদিন নতুন মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলো , যার নাম মার্ক্সবাদ ,লেনিনবাদ, মাও চিন্তাধারা । আর সেদিন থেকেই ভবতারণের রাজনীতিতে হাতে খড়ি শুরু হয়েছিলো' ।[৫৮]

তারপর সত্তর একাত্তর সালের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভবতারণ । গোপন মিটিং করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় । জেলে এসে পৌঁছায় । নকশালদের সঙ্গে সাধারণ বন্দীদের কথা বলা বারণ । তবুও ওদের মধ্যে থেকেই সন্ধান করে আগামী সংগ্রামী সেনাদের । শ্রেণিহীন, শোষণহীন যে সমাজের ছবি কমরেডরা দেখাতে চেয়েছেন তাতে আবিষ্ট হয়েছে ভবতারণের মতো ছোটলোক শ্রেণিতে পড়ে থাকা মানুষেরা । ' আমরা একটা শ্রেণীতে মিশে যেতে চাই , সেটা সর্বহারার শ্রেণী । মানুষ হিসাবে আমরা কেউ কারোর চেয়ে ছোট নই । শ্রেনীর অবস্থানই তো আমাদের মধ্যে পার্থক্যের সীমা টেনেছে । সেই জন্যই তো আমরা শ্রেণীসংগ্রামে সামিল হয়েছি । অতএব আমাদের লজ্জা বা সংকোচের কিছু নেই , আমরা যে পরস্পরের কমরেড' ।[৫৯]

জেলের ভিতরেই বিনা কারণে 'ঠ্যাঙ্গারে সিপাইবাহিনী' – র হাতে মার খায় ভবতারণ। ভবতারণের যদি মৃত্যুও হয় তাহলেও চিন্তিত নয়, জেল কর্তৃপক্ষ । কারণ জেল ভাঙ্গার মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে দিলেই কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত । আর ভবতারণ ভাবে শুধু একটিই কথা – 'মোরা গরীবীরাজ কায়েম করবই। রক্ত ... অনেক রক্ত দিয়ে ...'।[৬০]

২৮. অংশুর পরিচয় : অভিজিৎ গুহমুস্তাফি

একটি আত্মবিশ্লেষণের গল্প এটি । তরুণ হৃদয়ের রঙিন স্বপ্নমাখানো চোখে 'বিশ্ববিপ্লব' করার আশা । হাত মুঠো করে পৃথিবীর সমস্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তিকে কাঁপুনি ধরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা আর বাস্তবের লড়াই এক নয় । এই চরম সত্যটিই অংশু বসাকের জবানীতে

গল্পকার তুলে ধরেছেন । অংশুর বিবর্তিত জীবনের ধারাকে অনুসরণ করে লেখক কাহিনিটিকে নির্মাণ করেছেন । বরানগরের স্কুলজীবনের বন্ধু অভীকের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল । সেই অভীক আজ আর নেই । 'ওর কাঁধে কাঁধ দিয়ে শৈশবে আমি অনেক কিছু করেছি – পঙ্গু ভিখারীকে রাস্তা পার করে দিয়েছি, টিফিনের সময় স্কুলের ছাদে বসে সিগারেট খেয়েছি আর দাদার কবিতা টুকে নিয়ে নিজের নাম করে পড়ে শুনিয়েছি। আউট্রাম ঘাটের যে জলটার কাছে বসে আমরা দুজন ভবিষ্যতে ডাক্তার ও লেখক হবার স্বপ্ন দেখেছি সে জলটা আজ ঘোলাটে । অনেক অনেক বস্তাবন্দী অভীক ভেসে গেছে ওখান দিয়ে এই ক'বছরে'।[৬১]

স্কুলজীবনের শেষে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়েই নকশাল আন্দোলনের আহ্বানে কেঁপে উঠল সমগ্র কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গ । অংশুও নিজেকে খুঁজে পেয়েছে মিছিলের মধ্যে । কৃষকদের অধিকারের লড়াইয়ে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে নিজের অস্তিত্বকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছে । দুচোখ ভরে স্বপ্ন দেখেছে আর হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করেছে – 'আমরা নাকি সকাল আটটা – নটার সূর্যের থেকেও উজ্জ্বল। আমরা মানে যুবকেরা , আর পৃথিবী অবশেষে আমাদেরই'।[৬২]

যুবশক্তিকে হাতিয়ার করে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার যে কার্যক্রম নেওয়া হয়েছিল তাতে শহুরে শিক্ষিত যুবকদের গ্রামে গিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । 'সি. পি. আই(এম–এল)–ই প্রথম ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি যাঁদের একমাত্র কর্মসূচী ছিল গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে বিপ্লব সংগঠিত করা এবং পরবর্তী পর্যায়ে এ পথেই সমস্ত ভারতবর্ষে অভ্যুত্থান ঘটানো। ... এই বিপ্লবী সংগ্রামে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকই প্রধান পরিচালিকা শক্তি , অগ্রণী বাহিনী । কারণ এরা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরেছেন যে জোতদার জমিদারী (সামন্ততান্ত্রিক) শোষণ থেকে মুক্তির এটাই একমাত্র পথ । এই কার্যক্রম সফল করার জন্যে তাঁরা 'গ্রামে চলো' স্লোগান তোলেন এবং অনেক পার্টি কর্মীকে পশ্চিম বাংলায়

বিভিন্ন গ্রামে বিপ্লবের আবহাওয়া কি এবং গ্রামাঞ্চলের কোন অংশ বিপ্লবের সহায়ক বা বিরোধী তা যথাযথ নিরূপণের জন্য রিপোর্ট তৈরি করার কাজে লাগান' ।[৬৩]

কর্মসূচী গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন সর্বক্ষেত্রে সার্থক হয় না । শহুরে সুযোগ সুবিধায় অভ্যস্ত যুবকেরা সংগ্রামের সন্ধানে গ্রামে গেলেও গ্রামীন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বহুক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি । তাই অংশুও এই কর্মসূচীর অংশীদার হিসাবে গ্রামে গিয়েও থাকতে পারেনি । ফিরে এসেছে আবার কলকাতায় । নিজেকে নতুন করে চিনতে চেয়েছে । পুলিশি আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইতে সামিল হতে চেয়েছে । আত্মউন্মোচনের এই পর্যায়ে সে উপলব্ধি করেছে – 'আমি এখনও সাহসী হই নি, আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুতও না, আজও মনে পড়ে এই ধরণের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো । ভুল হবে আপনাদের যদি ভেবে বসেন , এই সবের মাঝখানেই আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি । বরং বলি , দরকার ছিল । দরকার ছিল আমার সাধের গণ্ডগোলে মেশানো কলকাতায় দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করা' ।[৬৪] এই অস্তিত্বের সন্ধানেই সে পৌঁছে যায় সিংভূমে । শ্রেণিগত পার্থক্যকে ঘৃণা করতে শিখে মিশে যেতে পারে কামরুদ্দিন, সুবল ঠাকুর, চেতু মাঝিদের সঙ্গে । এদেরকে কমরেড রূপে পেয়ে নতুন উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে ওঠে । আন্দোলনের কর্মীস্বরূপ জেলে যাওয়ার পুরস্কারও জুটে যায় । রুটিন মাফিক অত্যাচারের ছয়মাস পর জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর অংশুর বাবা তাকে পুনরায় কলেজে ভর্তি করিয়ে দেন । কিন্তু শান্তি কিংবা স্বস্তির জীবনে ফিরে যেতে পারে না আঠারোবছরের অংশু । আবার নতুন করে শুরু করতে চায় । মনে হয় 'আমরা নিশ্চয়ই পারব সংগ্রামকে আগের থেকে আরও উন্নত পর্যায়ে তুলতে । আমরা পারবই , শেষ যুদ্ধ আমরা জিতবই ...'।[৬৫]

সংগ্রাম একটা নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া । সে হয়তো স্তিমিত হয় । কিন্তু তার মধ্যেই থাকে নতুন করে উদ্দীপিত হওয়ার শক্তি । আর অংশুরাই হচ্ছে সেই শক্তিকে প্রজ্জ্বলিত করে রাখার সলতে ।

২৯. রক্ত : সুবিমল মিশ্র

'দেশব্রতী' পত্রিকার ১৬ ই এপ্রিল ,১৯৭০ সালের সংখ্যায় লেখা হয়েছিল – 'আমাদের প্রিয় নেতা চারু মজুমদার বলেছেন – "প্রতিটি জোতদারই হত্যাকারী, কাপুরুষ এই সশস্ত্র জোতদারেররা নিঃসহায় নিরস্ত্র ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীদের যুগ যুগ ধরে নিজেরা হত্যা করে চলেছে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেতমজুর গরীব চাষী পরিবারের কেউ না কেউ এদের হাতে নিহত হয়েছেন"। তিনি আমাদের আরো শিখিয়েছেন, "হত্যাকারীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থই মৃত্যু" – এই মহান আওয়াজে সাড়া দিয়ে সীমান্ত এলাকার বিপ্লবী কৃষকেরা পুলিশ, মিলিটারি পাহারার মধ্যেই বীরের মতন একের পর এক শ্রেণীশত্রুকে খতম করে চলেছেন'।

এই খতমের রাজনীতি শুধু গ্রামীন জীবনেই সীমাবদ্ধ ছিল না । শহরেও শ্রেণিশত্রু খতম করার তালিকা ক্ষুদ্র ছিল না । এই হঠকারী হত্যার রাজনীতি অনেক গল্পেই চিত্রিত হয়েছে । যেখানে হত্যাকারী বিবেকের সম্মুখীন হয়ে আত্মজিজ্ঞাসায় বিদীর্ণ হয়েছে । 'রক্ত' গল্পটি তারই নিদর্শন । হত্যার রাজনীতি কিংবা খতমের খতিয়ান আন্দোলনকে একটুও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে কিনা ? তা তর্কসাপেক্ষ । হত্যার সপক্ষে যতই যুক্তি দেওয়া হোক না কেন, হত্যার সমর্থন করা যায় না । এই গল্পে একটি পোড়ো বাড়িতে একজনের প্রতীক্ষারত চারজন রাজনৈতিক কর্মী জীবনের প্রথম 'খতম'টি করার অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করছেন । গুলি খাওয়ার পর লোকটির অবস্থা কিংবা রবিনের মনে হয়েছে লোকটিকে তার জ্যাঠার মতো দেখতে। এই ধরণের নানাবিধ চিন্তাসূত্রের মধ্য দিয়ে তাদের খুন করার সপক্ষে কোনো যুক্তিই প্রতিষ্ঠা পায় না । নিখুঁত হত্যার জন্য পার্টির কাছে বাহবা পেলেও মানসিকভাবে বিপন্নতার শিকার হতে হয় । এই হত্যার রাজনীতির পিছনে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত থাকলেও মানসিক যন্ত্রণার এবং দ্বন্দ্বের অবসান সহজসাধ্য নয়। তাই নকশাল আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর যখন ফিরে দেখতে হয় তখন এই সিদ্ধান্ত নিতেই হয়–'হিংসা স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক নিয়মসিদ্ধ, এমনকি ব্যক্তিহিংসাও পরিত্যাজ্য নয়। কিন্তু প্রকৃতির স্বভাব থেকে উত্তরণই তো মানবিক,

সেটাই তো ভাবিত কালচার । ত্রাসিত পৃথিবী ও ভারতে ভয়শূন্য চিত্ত ও উচ্চশির রাখাটাই তো কল্প – প্রাপ্তি, হিংসাশ্রয়ী বদলার রাজনীতি তো কানাগলি'। [৬৬]

৩০. টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ : শ্রুতিলিপি

১৯৮২ সালের ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে বাংলা ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে বিকেল বেলায় গোয়েন্দা বিভাগের মাঝারি অফিসার উমেশ সরখেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে বিংশ শতাব্দীর কার্ল মার্ক্সের।আপাত কৌতুকের মোড়কে বর্তমান রাজনীতির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও রাজনৈতিক নেতাদের সুবিধাবাদী অবস্থানকেই গল্পকার অত্যন্ত নিরপেক্ষ ভাবে তুলে ধরেছেন। ডান এবং বাম নির্বিশেষে দুই ধরণের রাজনীতিই যে আজ শুধু ফাঁকা বুলি আর বাজারী অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল তা বিংশ শতাব্দীর কার্ল মার্ক্সের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। উন্নয়নের পরিসংখ্যান আর মিথ্যা আশ্বাসের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির কোন সমন্বয় নেই। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর আমলে 'দেশে সবুজবিপ্লব ঘটে খাদ্যশস্যে দেশ স্বয়ংভর হয়েছে । দেশ অতি দ্রুত শিল্পপ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে'।[৬৭] কিন্তু বিংশ শতাব্দীর কার্ল মার্ক্সের জিজ্ঞাস্য উমেশ সরখেলকে 'আচ্ছা তুমি কি মনে কর খাদ্যে সেলফ সাফিসিয়েন্ট, মানে আত্মনির্ভরশীল হয়েছ তোমরা ? তোমাদের কি সব নাগরিকই দিনে দুবার পেট পুরে খেতে পাচ্ছে ?'[৬৮]

এই সমস্ত বক্তব্য উমেশকে শঙ্কিত করে তোলে । ব্যক্তিটির রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে সে সন্দিহান হয়ে ওঠে– 'এ আবার কোন্ রাজনৈতিক দলের সমর্থক? নিশ্চয়ই বামপন্থী । কিন্তু কোন্ দল ? পশ্চিমবঙ্গের বামমোর্চা সরকার তো এখন বড়ো বাজারিয়াদের বন্ধু । তবে বুড়ো সাহেব নির্ঘাত নকশালপন্থী'।[৬৯] উমেশ ইন্টেলিজেন্স বিভাগের চাকুরে জেনে বৃদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের সন্ধান করতে চান । তাদের সঙ্গে আলাপ করতেও চান । উমেশ বর্তমান

বুদ্ধিজীবীদের স্বরূপ বৃদ্ধের কাছে উন্মুক্ত করেন – ‘আমাদের দেশে অবশ্য একদল বুদ্ধিজীবী বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। এখন ও নিচ্ছেন । কিছু কবি – সাহিত্যিক তো শুধুমাত্র বডি – শো দিয়েই বড়ো বড়ো সরকারি বেসরকারি পুরস্কার পেয়ে যাচ্ছেন । তাঁরা কী লিখেছেন, সেগুলোর সাহিত্যিক বা কাব্যিক মূল্য কতটুকু তার মূল্যায়ন হয় না । এসবের পিছনে ব্যবসায়িক স্বার্থ, রাজনৈতিক পলিসি, এমনকী দালালি বা বখরার স্বার্থও জড়িত থাকে’।

স্বাধীনতার প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পরের পটভূমিকায় লেখা এই গল্পে লেখকের রাজনৈতিক পক্ষপাত স্পষ্ট হয়ে ওঠে । এই গল্পটি কোনো ব্যক্তি জীবনের অনুভূতিতে সীমাবদ্ধ নয় । সামগ্রিকভাবে যে সমাজ পরিবর্তন প্রত্যাশিত ছিল তা যে নিতান্তই রাজনৈতিক দলগুলির মিথ্যা বুলিতেই সীমায়িত সেই সত্যকেই আপাত অবাস্তব একটি পটভূমিকায় গল্পকার শাশ্বত করে রেখেছে ।

নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ছোটগল্পগুলির মূল প্রবণতার দিকে যদি নজর দিই তবে যে বিষয়গুলি প্রধান হয়ে ওঠে তা হল নকশাল আন্দোলনকে দমনের জন্য এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের উপর সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। এছাড়াও আর যে বিষয়টি বার বার ফিরে ফিরে এসেছে সেটি হল, এই আন্দোলন এক বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল মূলত ছাত্র ও যুবক শ্রেণির মধ্যে। এরা যে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিল বাস্তবে সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। কারণ নকশাল আন্দোলন যে কৃষি বিপ্লবের কথা বলেছিল বর্গাদার, ক্ষেতমজুর এবং বিভিন্ন শ্রেণির রায়তদের বিবিধ দাবির নিরিখে যে গণতান্ত্রিক কৃষক সংগ্রামটি সম্পন্ন হওয়া উচিৎ ছিল, তার মূল স্বরূপটি শহুরে নেতৃত্ব বা শহুরে কর্মীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। স্বাভাবিকভাবেই কৃষকদের দাবিগুলি পূরণ করা সম্ভব হয়নি। ফলত যে বিপুল শক্তির অপচয় ঘটে গেল তার পিছনের রাজনৈতিক – অর্থনৈতিক – সামাজিক কারণগুলির সন্ধানও কোনো কোনো গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। নকশাল আন্দোলনের উদ্দীপনায় যে সমস্ত শহুরে যুবকরা তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে বাজি রেখে গ্রামে গিয়েছিল কৃষকদের সঙ্গে থেকে

আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য , অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা আশাহত হয়েছিল। কারণ শহুরে মানুষের বিপ্লবের ভাবনা আর গ্রামের মানুষের জীবন ও শোষণের বাস্তব স্বরূপের মধ্যে যে কতটা ফারাক তা তারা কোনোভাবেই উপলব্ধি করতে পারেনি। বিপ্লবের রোমান্টিক কল্পনায় হঠাৎ আবেগে ভেসে গিয়ে যে হঠকারী সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছিল তার পরিণাম সুখকর হয়নি। আরো একটি বিষয় এই ধরণের বহু গল্পেই লক্ষ্য করা যায় সেটি হল নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যুবক শ্রেণির তাদের পারিবারিক যে রাজনৈতিক বিশ্বাসের ঐতিহ্য ছিল তার প্রতি তীব্র বিদ্বেষ। তাদের যাপিত জীবন ও রাজনৈতিক ভাবনা যে সুবিধাবাদের দ্বারা পরিচালিত তার ইঙ্গিত অনেক গল্পেই ব্যক্ত হয়েছে। শৈল্পিক উৎকর্ষতার মানদন্ডে প্রতিটি গল্পই যে সফল এমন কথা বলা যাবে না। 'বিপ্লবের অসময়ে' এমন ঘটনা ঘটেই থাকে। প্রাথমিক উন্মাদনা প্রকাশের উত্তেজনায় গল্পের শিল্পিত স্বরূপ বিঘ্নিত হয়। তবুও বলা যায় অনেক ক্ষেত্রেই লেখকেরা তাদের বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে দৃঢ় ও পক্ষপাতপুষ্ট হলেও গল্পের নির্মাণ ও রসপ্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো আপোস করেননি।

উল্লেখপঞ্জি :

১. ব্রজেন মজুমদার : 'খোদহাটির গল্প', নকশাল আন্দোলনের গল্প, সম্পা. বিজিত ঘোষ, পুনশ্চ, ৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা – ৯, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৯৯, দ্বিতীয় সং: জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ১০৮।

২. তদেব : পৃ. ১০৮।

৩. তদেব : পৃ. ১০৯।

৪. তদেব : পৃ. ১১১।

৫. তদেব : পৃ. ১১৬।

৬. পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায় : 'ভূমি ও ভূমিসংস্কার', দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২২৬।

৭. সুধীর করণ : 'সংকটের কাল', 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

৮. তদেব : পৃ. ৫৮।

৯. মহাশ্বেতা দেবী : 'সত্তরের দশক ও তারপরে', 'সত্তর দশক', (খণ্ড – এক) সম্পা. অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা- ৯, পৃ. ৪৩।

১০. মহাশ্বেতা দেবী : 'দ্রৌপদী', নকশাল আন্দোলনের গল্প, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

১১. তদেব : পৃ. ৬৭।

১২. মণি মুখোপাধ্যায় : 'গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার',নকশাল আন্দোলনের গল্প, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

১৩. তদেব : পৃ. ২৩৮।

১৪. তদেব : পৃ. ২৪১।

১৫. অসীম রায় : 'অনি', 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', প্রাগুক্ত , পৃ. ৭৫।

১৬. শৈবাল মিত্র : 'ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন', 'ষাট সত্তরের ছাত্র আন্দোলন' সম্পা. অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ, ২ই, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা- ৯, প্রথম সং: বইমেলা ১৯৯৮ দ্বিতীয় সং: মার্চ : ২০০৮, পৃ. ১১২।

১৭. অসীম রায় : 'অনি', প্রাগুক্ত , পৃ.৭৭ ।

১৮. শৈবাল মিত্র : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

১৯. বেণী দাশগুপ্ত : 'সন্তানের নাম ধান', 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬।

২০. শুকদেব চট্টোপাধ্যায় : 'তরাইয়ের মা', 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', প্রাগুক্ত,

পৃ.২৪৯।

২১. অভিজিৎ সেনগুপ্ত : ‘বারো – বারো বছরের পর’, ‘নকশাল আন্দোলনের গল্প’, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।

২২. তদেব : পৃ. ২৫৯।

২৩. দীপংকর চক্রবর্তী : ‘অপ্রতিদ্বন্দ্বী’, নকশাল আন্দোলনের গল্প’, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫।

২৪. শৈবাল মিত্র : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

২৫. বারিদবরণ চক্রবর্তী : ‘সবুজ দ্বীপের মাঝি’, ‘নকশাল আন্দোলনের গল্প’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩।

২৬. তদেব : পৃ. ৩৩৭।

২৭. সিদ্ধার্থ সাহা : ‘ছোট বকুলপুরের পরের কথা’, ‘নকশাল আন্দোলনের গল্প’, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৮।

২৮. তদেব : পৃ. ৩৫১।

২৯. তদেব : পৃ. ৩৫১।

৩০. স্বপন চক্রবর্তী : ‘রতনলাল’, ‘নকশাল আন্দোলনের গল্প’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩।

৩১. তদেব : পৃ. ৩৫৪।

৩২. গৌতম ভদ্র : ‘বৈপ্লবিক চৈতন্য না নৈরাজ্যবাদ?’, ‘দেশ’, (পাক্ষিক) ১৭ই মে, ২০১৭, পৃ. ২৬।

৩৩. একলব্য ঘোষ : ‘হাবা’, ‘নকশাল আন্দোলনের গল্প’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫।

৩৪. তদেব : পৃ. ৩৯১।

৩৫. ভগীরথ মিশ্র : ‘মায়ের জন্য’, নকশাল আন্দোলনের গল্প’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০।

৩৬. তদেব : পৃ. ৪০৪।

৩৭. তদেব	:	পৃ. ৪০৪।
৩৮. স্বর্ণ মিত্র	:	'প্রসব', 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২।
৩৯. তদেব	:	পৃ. ৪১৩।
৪০. তিমিরবরণ সিংহ	:	'সূর্যসেনা', 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬।
৪১. অসীম চট্টোপাধ্যায়	:	'নকশালবাড়ি : সম্ভাবনা ও ট্র্যাজেডি', 'দেশ', ১৭ই মে, ২০১৭, পৃ. ২০।
৪২. তদেব	:	পৃ. ২০।
৪৩. সুযশ ভট্টাচার্য	:	'গান্ডীব', 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮।
৪৪. তদেব	:	পৃ. ৪৫৮।
৪৫. তদেব	:	পৃ. ৪৬০।
৪৬. অমর মিত্র	:	'ডাইন', 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩।
৪৭. তদেব	:	পৃ. ৪৮৪।
৪৮. তদেব	:	পৃ. ৪৮৭।
৪৯. স্বপন চক্রবর্তী	:	'স্বস্ত্যয়ন', 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', প্রাগুক্ত, পৃ.৫০৯।
৫০. তদেব	:	পৃ.৫১৩।
৫১. সনৎ বসু	:	'মৃত্যুহীন', 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০০।
৫২. তদেব	:	পৃ. ৬০৪।
৫৩. বশীর আল্‌হেলাল	:	'মোকাবিলা', 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৬।
৫৪. তদেব	:	পৃ. ৫৮৭।
৫৫. শারদীয়া 'দেশব্রতী',	:	১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১।
৫৬. রামকুমার মুখোপাধ্যায়	:	'মৌজা ডোমপাটি', 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৫।
৫৭. তদেব	:	পৃ. ৬৭৮।

৫৮. নিমাই ঘোষ : ‘ভবতারণের গল্প’, ‘জেলখানায় লেখা সত্তর’, সম্পা. শুভেন্দু দাশগুপ্ত, ঠিক ঠিকানা,২৯/৩ শ্রী গোপাল মল্লিক লেন,কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ: ২০০০, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সং, ২০১৭, পৃ. ৪১।

৫৯. তদেব : পৃ. ৪৩।

৬০. তদেব : পৃ. ৪৫।

৬১. অভিজিৎ গুহমুস্তাফি : ‘অংশুর পরিচয়’, ‘জেলখানায় লেখা সত্তর’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

৬২. তদেব : পৃ. ৪৭।

৬৩. নির্মল ঘোষ : ‘নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

৬৪. অভিজিৎ গুহমুস্তাফি : ’অংশুর পরিচয়’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

৬৫. তদেব : পৃ. ৫২।

৬৬. গৌতম ভদ্র : ‘বৈপ্লবিক চৈতন্য না নৈরাজ্যবাদ’, ‘দেশ’, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

৬৭. টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ : ‘শ্রুতিলিপি’, ‘নকশাল আন্দোলনের গল্প’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৬৮. তদেব : পৃ. ৩৫।

৬৯. তদেব : পৃ. ৩৫।

৭০. তদেব : পৃ. ৩৬।